বিচিত্র রূপিণী

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

উৎসর্গ

কৃষ্ণা
কাবেরী
সরস্বতীকে

বরের মাসী কনের পিসী

ডালুমাসির সঙ্গে দেখা। নিউ মার্কেটের মুখটাতেই। বাজারের প্রতি বিমুখ হয়ে তিনি বেরুচ্ছিলেন—

'হগ্ সাহেবের বাজারে বলে সস্তা! সস্তা না ছাই! নাঃ, কলকেতায় মনের সাধে কেনাকাটার আর সে-দিন নেই! আরে, তুই এখানে কী করছিস?' ব্যাজার মুখে বললেন।

তাঁর স্বগতোক্তির মাঝখানে নিজেকে ঠিক স্বাগত বলে আমার বোধ হলো না। এমন জায়গায় এহেন সময়ে আমাকে তিনি আশা করেননি।

আমিও না। চৌরঙ্গীর মোড়ে এসে বেঁকবার মুখেই মাসিমার নজরে ঠেকে গিয়েছি।

সিনেমায় যাচ্ছিলুম। সে কথাটা চেপে গিয়ে বললুম—'এই ঘুরছিলাম এমনিই! এমন কিছু কাজ নেইকো—'

'তা, হাওয়া খাওয়ার জায়গা পেয়েছিস ভালো! সন্ধ্যে বেলায় কোথায় ময়দানে বেড়াবি, তা না, এই বাজারের ঘিঞ্জিতে— কী যে তোরা হচ্ছিস্ দিনকের দিন! হ্যাঁ রে, ইতুটিতুদের খবর কী? তাদের তুই কোথায় খাওয়াস বল্ তো?—বলছিলো ওরা একদিন!'

'যত্রতত্র। যেখানে খিদে পায় আর যখনি খিদে পায় আর যা কিছু সামনে পাই তাই আমরা গোগ্রাসে গিলি—'

'না না! কোন রেস্তোরাঁ না কোথায় বলছিলো যেন! তা,

চল্ না বাপু, দেখি গে, কেমন তোদের সেই রেস্তোরাঁটা।' ডালু মাসি যেন চঞ্চল হলেন—'একটা রিস্‌কা ডাক্।'

'রিস্‌কা? সেটা কি একটু রিস্‌ক্ হবে না মাসিমা? বলতে নেই, ভগবানের দয়ায় দুজনেই আমরা যেমন হৃষ্ট-পুষ্ট—' আমি বলি, 'তাতে পাশাপাশি বসলে একটু ঠাসাঠাসি হবে না কি? আর যদি—' কথাটা আমার গলায় আটকায়, 'অবশ্যি, তোমার কোলেই মানুষ হয়েছি সেকথা সত্যি। কিন্তু সেই সুবাদে এখনো যদি এই ধেড়ে বয়সে তোমার কোলে বসে যাই লোকচক্ষে সেটা কি খুব ভালো দেখাবে? সুদৃশ্য যে হবে না তা নিশ্চয়!'

তারপরে আমাদের দেহভারে রিক্সা যদি উল্টে যায় আর রিক্সাওয়ালা, ফাঁসির আসামীর মতো, রিক্সাকাষ্ঠে ঝুলতে থাকে সেই দৃশ্যান্তরের কথা ভাবতেই আমার হৃৎকম্প হয়।—'না, মাসিমা, রিক্সা নয়।'

বলতে হয় না। ডালুমাসি ততক্ষণে একটা ট্যাক্সি ডেকে বসেছেন।

রেস্তোরাঁর ছোকরা টেবিলের কিনারে এসে ভিড়তেই মাসিমা বললেন—'ইতুদের যা খাওয়াস্—ওরা গল্প করে—সেই সব আনা তো। কী খায় ওরা?'

'ইতুরা? যাহা পায় তাহাই খায়। সুবোধ বালিকার মতোই।' বলে আমি বয়কে খাদ্যের তালিকা বাতলাই।

ছেলেটি খাবারগুলি এনে টেবিলে রাখে।

'মাসিমা, তোমার জন্যে কী আনাবো? হট্ কফি, না কোল্ড কফি, কোনটা তোমার পছন্দ?'

'কফি আইসক্রীম বলে কী একটা আছে না? তাই আন্।' পটাটোচিপের টুকরো নিয়ে টাকরায় ফেলে মাসিমা বলেন—'তোর সুবোধ বালিকার কথাটায় মনে পড়লো।...সুবোধের মেয়ে শম্পাকে জানিস তো? আমার কাজিন সুবোধ?'

'সুবোধমামার মেয়ের কথা বলছো? শম্পাকে আর জানিনে? কতবার দেখেছি। কেন, কী হয়েছে তার?'

'বিয়ে হচ্ছে যে।'

'বিয়ে হচ্ছে? বাঃ, বেশ তো, সে তো ভালো কথাই। সুখের কথা।'

'সুখের তো বটে! হচ্ছে আবার আমাদের কণুর সঙ্গে। কণু? কণাদ—কণাদকে চেনো না?'

'কণাদকে চিনবো না? কালু মাসির ছেলে কণাদ। কিন্তু—কিন্তু সুবোধমামা তো তোমার কাজিন—তাই না?' কেমন যেন গোল বাধে আমার: 'শম্পার তো তুমি পিসি হলে তাহলে? তাই না? তাহলে—তাহলে ওরাও তো কাজিন হলো?'

'তবে আর বলছি কি!' মুখভর্তি কেকের ফোকর দিয়ে মাসিমার ক্ষুব্ধ কণ্ঠ বেরিয়ে আসে—'লাভ-ম্যারেজ! সেই হয়েছে কথা।'

'তা, এমন মন্দ কথা কি? লাভ ম্যারেজ খারাপ কি আর?' কাজুবাদামদের মুখস্থ করে বলি—'কাজিন-বিয়ে তো চালু হয়েছে আজকাল। চলছে বেশ।'

'ভালোবেসে বিয়ে করাটা খারাপ এমন কথা আমি বলিনে।' মাসিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালেন—'তা কেন বলবো! তবে প্রেমে-পড়া

মেয়েদের আমি হু'চক্ষে দেখতে পারিনে। তারা যেন কী রকম।'

'কিরকম একরোখাই যেন, তাই না মাসিমা? একজনের ওপরেই যত রোখ। আশে পাশে আরো যে কত রয়েছে তা যেন তাদের চোখেই পড়ে না।' আমার পতনোন্মুখ দীর্ঘনিশ্বাসকে সামলাতে হয়। 'কিন্তু তোমার শম্পার কথা আলাদা। অমন মেয়ে তো—'

'না, শম্পার কথা আমি বলছিনে। শম্পা আমার তেমন মেয়ে নয়। শম্পার আমি পিসি, ওর এইটুকুন্ বেলা থেকে দেখছি ওকে—আমি কি ওকে জানিনে? তবে কণাদেরও আমি মাসী তো। তার দিকটাও আমায় দেখতে হয়।'

'হু'দিকই তোমার দেখা উচিত।' আমি বলি। মাসিমার পক্ষে প্রেমে-পড়া-মেয়ের মতো একচোখা না হয়ে কাশ্মিরী শালের মতো দোরোখা হলেই যেন ভালো হয়, আমার ধারণায়।

'তা কি আমি দেখচিনে? শম্পাকে তো বলেই দিয়েছি তোর গানের টুইশানিগুলো ছাড়িসনে। এত কষ্ট করে যখন গীতশ্রী হয়েছিস! তা, শম্পা বলে, পিসীমা, টুইশানিগুলো যে সব সন্ধ্যের পরে। কণাদ তখন আপিস থেকে খেটেখুটে আসবে, তখন তার কাছে না থেকে টুইশানিতে যাওয়াটা কি ভালো দেখায়?'

'তা, তুমি কি জবাব দিলে তার?'

'আমি বললুম—ক'দিন লা! ও ক'দিন? দিনকতক বাদেই দেখবি কণাদ আপিস থেকে আর বাসায় ফিরছে না, সোজা চলে যাচ্ছে তার ক্লাবে কি বন্ধুদের আড্ডায়। আসছে রাত বারোটা

বাজিয়ে। তখন? তখন তোর সময়টা কাটবে কী নিয়ে শুনি? এখন যদি ওই টুইশানিগুলো সব ছেড়ে দিস?'

'খুব বিবেচকের মতন—মানে, বিবেচিকার মতোই তুমি বলেছো।' আমায় মানতে হয়।

'ওসব—আমার জানা আছে। বিয়ের প্রথম মোহ ক'দিন থাকে ছেলেদের? তা ছাড়া, খালি তো বন্ধুই নেই কণাদের। বন্ধুনীও ঢের। স্কটিশে পড়তে শুধু শম্পাই না, আরো অনেক মেয়ের সঙ্গে ভাব জমেছিলো কণুর—তা কি আমি জানিনে?'

তা বটে। আমাদের ডালু মাসিকে যুবক-চরিত্রের জহুরি বলা যায়। মণিমাণিক্যের যে কোনো কিসিমের তিনি 'কনাসিওর'। দেখবামাত্রই টের পান—তার নাড়ীনক্ষত্র বলে দিতে পারেন। নিজের ভাইপো-বোনপো-ভাইঝি-বোনঝি-রত্নদের প্রত্যেক কণাটিকে তিনি চেনেন। কণাদ সম্বন্ধেও তিনি কিছু কম 'সিওর' নন।

'তা, বলে দিয়েছো তো শম্পাকে—সেই ব্র্যাকেটগুলোর কথা?'

'কিসের ব্র্যাকেট?'

'ঐ বন্ধুনী—না বন্ধনী—কী বললে যে?'

'তা আর বলিনি? এইসব লাভ-ম্যারেজ—কাজিন-বিয়ের কী পরিণাম যে দাঁড়ায়, তা বলতে কি আমি বাকি রেখেছি? কিন্তু বলা বৃথা। এসব হিতকথার একটাও যদি ওর কানে ঢোকে!'

'তাই হয় মাসিমা' আমি জানাই: 'তাই হয়ে থাকে। প্রেমে পড়লে যে খালি কানাই হয় তাই নয়, কালাও হয়ে যায়।'

'কণাদকেও বলিনি কি! কিন্তু শুনলে তো!' ডাল্লুমাসির দীর্ঘশ্বাস আমার ডালপালায় নাড়া দেয়। কানের পাল্লায় ঝাপ্‌টা মারে। মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠে।

'ও-ও বুঝি চোখে কানে দেখতে পাচ্ছে না?'

'চোখ কান থাকলে তো। বলিনি কি, শম্পাকে নিয়ে অতো ঘুরিসনে, আজ এ রেস্তরাঁয় কাল সে রেস্তোরাঁয় গুচ্ছের গেলাসনি অমন করে'। বিয়ের পরে দেখিস এমন মুটিয়ে যাবে শম্পু—দেখে নিস—এই খাওয়ানোর ফল কী দাঁড়ায়, বুঝবি তখন। ওর মাকেও তো দেখেছি বাবা, কালুর মতন অমন মুটকী সাতজন্মে আমি দেখিনি।'

এই জন্মে—ইহলোকেই দেখা যায়—আয়নার দিকে তাকালে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায়ের অনুশাসন মেনে একথা কারো মুখের ওপর বলা যায় না। অন্য কথায় যেতে হয়—'তা, ও বুঝি ওর শাশুড়ীকে ছাখেনি? মানে, ওর প্রাক্তন মাসিমাকে?'

'দেখবে না কেন? চম্পা-বৌদি মারা গিয়েছে ক'দিন আর?'

'দেখেছে? চম্পামামীর চম্পটের আগেই দেখে নিয়েছে? তবুও, এত দেখেও ওর শিক্ষা হচ্ছে না?'

'শিক্ষা হবে যখন ঠেকে শিখবে। শম্পা যখন ইয়া মুটিয়ে যাবে টের পাবে তখন। যখন ঐ মুটকী মেয়েকে ল্যাজে বেঁধে নিয়ে ঘুরতে হবে তখন বুঝবে আমার কথার দাম। ছুঁড়িটা অমনি ছিপছিপে থাকবে নাকি চিরকাল?'

কথাটা আমি ভাবি। কণামাত্র কণাদ কণারকের মতো মোটা শম্পার মোট ঘাড়ে করে ঘুরছে—ছবিটা যেন চোখের ওপরে

ভেসে ওঠে! আহা, ভূত হবার পূর্বে, এই অভূতপূর্ব দৃশ্যটা চর্মচক্ষে স-মাসিমা যদি দেখে যেতে পারি! হায়, তেমন ভাগ্য কি হবে?

'আর তাও বলি বাপু, অ্যাতো কিসের? কণাদের যেন কী হয়েছে! কেন, শম্পা বৈ কি আর মেয়ে নেই?'

মাসিমার বৈশম্পায়নের ভূমিকায় আমার জনমেজয়ের মতো শুধু চুপ করে শোনা। কিন্তু দ্বিরুক্তি করতে হয় এবার—

'যা বলেছো! আবার একথাও বলতে হয়, কেন, কণাদ ছাড়া কি ছেলে নেই? আশপাশে তাকালে কাজের মতো কাজিন আরো কি পাওয়া যেতো না?'

'কেন যাবে না! সেকথাও তো বলেছি ওকে! বলেছি যে, একহারা কণাদের সঙ্গে তোর ঠিক মানায় না। এখন তোর এই চেহারায় যদি বা খাপ্ খায়, বিয়ের পর যখন তুই মুটকী হবি, তোর মার মতো হবিই একখানা, তখন সে যে কী বিচ্ছিরিই দেখতে হবে! তার চেয়ে এখনই যদি তুই একটা মুটকো দেখে—যদি কাজিন বিয়েতেই তোর এত অভিরুচি তো তোর কাজিনদের ভেতরেই পেতে পারিস তেমনটা—যাকে বলে রামমুটকো—' বলে মাসিমা হঠাৎ থেমে, কেন জানি না, পাল্টে নেন কথাটা—'তা, ও কিনা হেসেই উড়িয়ে দিলো।'

'দিলো বুঝি?' আমিও একটু ম্লান হেসে কথাটাকে জুড়িয়ে নিলাম।—'তা দিক। তা, ওদের বিয়েটা যাতে ভালোয় ভালোয় হয়ে যায়, তার জন্যে তুমি বেশ খাটছো তাহলে?'

'নইলে আর কে খাটবে বলো। খাটবার আর কে আছে ওদের। আহা, মা নেই বেচারির! শম্পা আমার আদরের

ভাইঝি! আমি ছাড়া কে দেখবে ওকে বলো! বাধ্য হয়ে আমাকেই সব দেখতে শুনতে হচ্ছে। তার বিয়ের কেনাকাটা করতেই এসেছিলুম মার্কেটে! তা বাছা, যা গলাকাটা দর হয়েছে সব জিনিসের—'

'তা বটে; মাথা গলায় সাধ্যি কার। যা দর হয়েছে সব জিনিসের ভেবে দেখলে—' বলে' আমি ভেবে দেখি। তা, প্রায় মাসিপিসির দরদের মতোই গলাকাটা, খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়।—'তাহলে এই বিয়ের ব্যাপারে তোমার খুব ধকল যাচ্ছে কী বলো? সব তো দেখতে শুনতে হচ্ছে তোমাকেই!'

'কে আর আছে দেখবার! সুবোধ একা মানুষ, কদ্দিক সামলাবে? তাছাড়া, শুধু শম্পা নয়, কণাদকেও দেখতে হচ্ছে-তো! তার ঝক্কিও নেহাৎ কম নয়!'

'তার ঝক্কিও পোহাতে হচ্ছে তোমাকে! বলো কি? কিন্তু তার তো আর শাড়ি ব্লাউজ নয় যে তোমায় পছন্দ করতে হবে। যদ্দূর জানি, বিবাহিত ছেলেরা এখনো শাড়ি পরে না। অন্ততঃ, বাড়ির বাইরে নয়।'

'শাড়ি নয়, সে ক্ষেপেছে নতুন গাড়ি কিনে শম্পাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে হাজারিবাগ। কলকাতা থেকে হাজারিবাগ— মোটরে।'

'মধুচন্দ্রিমায়! বুঝেছি।'

'গা জ্বালা করে এই সব অনাছিষ্টি দেখলে! কেন রে বাপু, আমাদেরকে কি কেউ কখনো বিয়ে করেনি নাকি! কী যে দেখেছে সে ওই শুঁটকিটার মধ্যে, সে-ই জানে।'

'তা, তার গাড়ি পছন্দের ভারও কি তোমার ওপরে নাকি ?'

'সে ভার আমি নিলে তো! পষ্টই বলে দিয়েছি তাকে, না বাপু, ওসবের মধ্যে আমি নেই। অকারণ বাজে খর্চায় নেই আমি। যেতে হয়, তোমার যে পুরোনো গাড়ি আছে তাতেই যাও। যতোই লঝ্ঝর হোক, হাজারিবাগ যাওয়া যায় খুব। কেন? এতদিন তো শম্পাকে নিয়ে ওতেই বেশ ঘুরেছিলি।···তা ও বলে কি—নাঃ, একেবারে গোল্লায় গিয়েছে হতভাগা!' কণাদের মাসিমাকে গালে হাত দিয়ে মুহ্যমতী হতে দেখি।

'কী বলে হতভাগা ?' উহ্য কথাটাকে নাগালে আনার চেষ্টা আমার।

'বলে কি যে, সে-গাড়িতে বোনকে নিয়ে ঘোরা যায়, বন্ধুকে নিয়েও বেড়ানো চলে, কিন্তু বৌকে নিয়ে—নাঃ, একদম্ বেহেড্ হয়ে গিয়েছে কণুটা। আস্তো একটা হনুমান!'

'আমারও তাই অনুমান।' ব্যক্ত করি।

'বলেছিলুম বুঝিয়ে যে, পুরোনো গাড়িটার ওপর দিয়েই যাক। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের যা বাঁকাচোরা রাস্তা। আমার জানা আছে বেশ। বলে সেখানে বড় বড় মোটুরেরাই তাল পায় না। আর, তুমি কি ভেবেছো, ছুঁড়িটা অতখানি রাস্তা কণাদের পাশে চুপটি করে বসে থাকবে? একবারও হাত দেবে না স্টিয়ারিং-এ? চালাতে চাইবে না গাড়ি? আর মেয়েরা গাড়ি চালালে—তা সে নতুন বৌ-ই হোক আর হাতীই হোক—কী যে হয় তা জানতে আমার বাকি নেই।'

'হাতীটাকে একবার গাড়ি চালাতে দেখেছিলাম বটে

সার্কাসে।' আমি বলি। 'তা তুমি কি বলছো যে ওরা স্টিয়ারিং নিয়ে হাতাহাতি করবে। আর তাই করতে গিয়ে—'

'আমি কেন বলবো, বলবে সবাই। খবর কাগজেই দেখবি দু'দিন বাদে। 'হাজারিবাগের পথে ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা'—বড় বড় হরফে চোখে পড়বে সবার। তাই আমি ভালো কথাই বলেছিলুম কণাদকে, সেই তো তোরা হতাহত হবি, হবিই, শুনবিনে কিছুতেই, তখন তোদের সঙ্গে নতুন গাড়িটাও আবার কেন যায়! তা, আমার কথা শুনলে তো?'

শাক্‌লা-পাক্‌লা

কী সুখে যে মানুষ নিজের চিলকোঠার আরাম ছেড়ে চিল্কায় মরতে যায়! ভ্রমকে বাড়তে দিলেই তা ভ্রমণ হয়ে ওঠে এ ধারণা আমার চিরকালের। চিরদিনের মতোই বদ্ধমূল। সেই আমারই যে একদা মতিভ্রম হয়ে দেশভ্রমণে মতি হবে, তা আমি কোনোদিনও ভাবিনি।

কিসের জন্যে মানুষ দূরদেশে যাবে, যদি তা দ্বারদেশেই মিলে যায়? হাতের কাছেই যে-সুধা, যে-মাধুরী, তাই ফুরিয়ে শেষ করা যায় না; কিসের মাধুকরী নিয়ে বিদেশ যাওয়া? যদি দেখার চোখ থাকে তো দুয়ার থেকে দু' আড়ার মধ্যেই অফুরন্ত রহস্য; সারা ভূভারত সেই রহস্য-কাহিনীরই ধারাবাহিক। দরজার কাছেই যার ছড়াছড়ি, তার জন্যে হরিদ্বারে গিয়ে মাথাকোটার দরকার করে না। বাড়ির সঙ্গে আড়ি করে বাইরে যাওয়া বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু নয়। চোখের সামনেই নিত্যনূতন। চোখ মেললেই যাকে দেখা যায়, তাকে নাসিক ঘুরে দেখার মানে? নাকাল হওয়া বই তো না? নতুনের খোঁজে নিরুদ্দেশে না গেলেও হয়। বাড়ির খাঁজেই নিতুই নব-র উদ্দেশ মেলে।

তবে কিনা, এত বুঝেও···ভ্রম হচ্ছে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। আর বলেছি তো, ভ্রম থেকেই ভ্রমণ। এবং মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম—

তাও বলে দিয়েছে। আর এই মতিভ্রম, মুনি হলেও যেমন হয়, 'মনি' হলেও তেমনি হয়ে থাকে।

এ বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা···পূজোর ফাঁকে টাকাটা হাতে আসার সাথে সাথে 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুণগুণিয়ে'! চিল্কার থেকে প্রবাসিনী এক আত্মীয়ার চিঠি পেলাম।···'এবার পূজোয় বেড়াতে এস না এখানে? চিল্কা সহরের থেকে একটু দূরে এ জায়গাটা আমাদের বেশ নিরিবিলি।· তাহলেও হ্রদের ধারেই, কিন্তু তেমন ঘিঞ্জি নয়, গোলমাল নেই, শান্তিময়। অনেকগুলি বাঙালী পরিবার এখানে রয়েছেন। এখানকার পরিবেশ ভালো···'

দার্জিলিং-এরও পরিবেশ ভালো। আমার কয়েকটি আলাপী সেখানেও হানা দিয়েছেন এবার। তাঁদের আমন্ত্রণ এড়িয়েছি। হোক না পরিরা বেশ; প্রতি পদক্ষেপে পরবৎ ঠেলে পরিবৎদের কাছে যেতে হলে মনে হয়, 'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ!' এসব পরিত্যাগ করে ভূমিতে গিয়ে থিতু হইগে। ভূমৈব সুখম্। পরিলোকে যেতে হলেও পাহাড়-ভাঙা খাটুনি আমার পোষায় না। তাই সে-আপসোসে না এগিয়ে অবশেষে—

পরলোকই বলা যায়। চিল্কার খর্পরে এসে পড়লাম! আমার মতো কলকাতাসক্ত লোক, যাকে কলকাতা থেকে নড়ানো খুব শক্ত ব্যাপার, সে যে চিল্কার পাড়ে এসে···যে নাকি হাওড়ার দু'-ইস্টিশন দূরে বালিবধেই এগুতো না, তাকেই যে লঙ্কা ডিঙিয়ে চিল্কায় এসে হাবুডুবু খেতে হবে, তা কে ভেবেছিল! কিন্তু অষ্টম আশ্চর্য, খালি ইতিহাস আর ভূগোলেই নয়, মানুষের মধ্যেও দেখা দেয় এক-এক সময়!

অষ্টম আশ্চর্যটিকে লেকের স্বচ্ছ জলের আয়নায় দেখছিলাম। দেখতে দেখতে আরো সব আশ্চর্য দেখা দিতে লাগলো। কালো রঙের, নানান ঢঙের। একপো, দেড়পো, আধ সের, পাঁচপো, আড়াইসেরি, পাঁচসেরি সাইজের। দশ বিশ সেরের এক-একটাকেও ঘাই মেরে উঠতে দেখা গেল মাঝে মাঝে।

এমন কি, আড়াইমনী একটা যেন লাফিয়ে উঠলো হঠাৎ। এই চোখের সামনেই!

উঠতে হলো আমাকেও। এক দৌড়ে বাজারে গিয়ে ছিপ, হুইল ইত্যাদি মাছধরার সব সরঞ্জাম কিনলাম। আর সেই আত্মীয়াটির কাছ থেকে কিছু ময়দার গুলতি নিয়ে ফিরলাম।

আসতে আসতে ঘণ্টাখানেক গিয়েছে। দেখি এর মধ্যেই এক ভদ্রলোক ছিপ ফেলে সেখানে বসেছেন এবং তাকিয়ে দেখবার মতো কয়েকটিকে ধরে ফেলেছেন এর মধ্যেই। একটি কিশোরী, খুব সম্ভব তাঁর মেয়েই হবে, উদ্ধৃত মাছগুলিকে সামলাচ্ছিলো।

আমি তাদের কাছাকাছিই ছিপ নিয়ে বসলাম। কিন্তু বসে থাকাই সার, ঘণ্টা খানেক পার হয়ে গেল, একটা মাছও ঠোকরালো না আমার বঁড়শিতে। ওদিকে জল তোলপাড়-করা আরেকটাকে ভদ্রলোক গেঁথে বসেছেন!

পেল্লায় মাছ! লাফঝাঁপ দেখেই বোঝা যায়। আমার ছিপ ফেলে ওঁর সহায়তায় আমি এগুলাম, কিন্তু তার কোনো দরকার ছিলো না। আমি পৌঁছবার আগেই তিনি আধমণের অবতারটিকে ডাঙায় তুলতে পেরেছেন। একক চেষ্টাতেই।

'কী টোপ ব্যাভার করছেন আপনি?' কথাচ্ছলে আমি শুধোলাম।

ভদ্রলোক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। মিনিট খানেক তাকিয়ে থেকে বললেন—'শাক্‌লা-পাক্‌লা'। বলেই সিগ্রেট ধরিয়ে আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে টানতে লাগলেন নিজের মনে।

শাক্‌লা-পাক্‌লা আবার কী রে বাবা? শাকটাকজাতীয় কিছু নাকি? শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় জানি, কিন্তু মাছ ডাকা যায় বলে শুনিনি তো! হতেও পারে বা, নিরামিষ না হলেও নীরের সঙ্গে মিশে থেকে নিরামিষাশী তো হতে পারে মাছরা? খেলেও খেতে পারে শাক।

খুকীর হাতের টোপদানিটার ফাঁকে উঁকি দিলাম। কাঁকড়ার মতো কতকগুলো কী যেন টিনের কৌটো-ভর্তি। আঙুল দিয়ে টিপে দেখলাম, বেশ নরম। কিন্তু যদ্দূর আমার জানা, কাঁকড়া তো তার খোল নলচে সব নিয়ে বেশ কড়াই হয়ে থাকে। কাঁকরের মতোই, কাঁকড়ার তো নরম হবার কথা নয়। না, জানতে হলো ব্যাপারটা—

'মশাই, আমি এধারে একেবারে নতুন—' নতুন করে কথা পাড়ি: 'এই ধরনের কাঁকড়া কিম্বা শাক্‌লা, যাই বলুন—কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারেন?'

'পাবেন না।' আমার দিকে সন্দিগ্ধ একটি কটাক্ষ ছুঁড়ে তিনি বললেন—'এ অঞ্চলে তো নয়। পেতে হলে আপনাকে পুরী কিম্বা ভুবনেশ্বরে যেতে হবে।'

ফের নিজের ছিপের কাছে ফিরে এলাম। এসে বসলাম চুপটি করে'। বসে রইলাম ঘণ্টা ছয়েক। একটা আধছটাকীও আমার বঁড়শিতে ঠোকর দিলো না ভুলেও। তিনি আরো গোটা কয়েক পাকড়ালেন।

পরদিন সকালে উঠেই শাক্‌লার খবর নিতে বেরুলাম। লেকের ধারে ধারে যাকে পেলাম তাকেই ডেকে ডেকে জিগেস করলাম। একজন বললেন, 'এই হ্রদের মাছ ধরতে হলে শাক্‌লাই একমাত্র অস্ত্র। শাক্‌লা কিংবা পাক্‌লা, পাক্‌লা দিয়েও ধরা যায়, তবে শাক্‌লাই হচ্ছে প্রশস্ত।'

বাকি এগারো জনের কাছ থেকেও সেই একই প্রশস্তি শোনা গেল। শাক্‌লার কিংবা পাক্‌লার।

অবশেষে একটা ছেলেকে পাকড়ালাম। বন্ধুভাবে তাকে কাছে টেনে স্নিগ্ধকণ্ঠে শুধালাম : 'ভাই, শাক্‌লা জিনিসটা কী, তুমি আমায় বাতলাতে পারো?'

আমি যেন আকাশের চাঁদ চেয়েছি, এমনি ভাবখানা দেখালো সে।—'শাক্‌লা? শাক্‌লা হচ্ছে এক রকমের কাঁকড়া।'

'এক রকমের কাঁকড়া?'

'হ্যাঁ, খোলস ছেড়েছে এমন কাঁকড়া।'

'ও! আর, পাক্‌লা?'

'ও এক ধরনের চিংড়ি।' বলে চ্যাংড়াটা পায়ের কাছের একটা ঢেলাকে শুট্ মেরে লেকের জলে ঢেউ তুলতে পাঠালো।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। এই এক ধরনের বিবরণ থেকে

ওদের একটাকেও যে ধরতে পারবো, তা আমার মনে হলো না। চিল্কার মাছ, তার টোপসমেত, আমার ধারণাতীতই থেকে গেল জীবনের মতো।

'ছ্যাখো, তোমাদের দেশে এই আমার প্রথম আসা।' আমি একটু আশা নিয়ে বলি—'এই যে শাক্‌লা-পাক্‌লা তুমি বলছো, এদের কি করে চেনা যায় বলো তো? চিনতে পারা যায় কী দেখে?'

ছেলেটা চিল্কার দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকালো খানিক। তারপর বলল—'দেখলেই চেনা যায়।'

'তা তো বুঝলুম, কিন্তু এখন কোথায় দেখা পাবো এই শাক্‌লাদের, তা আমায় বলতে পারো?'

কচি মুখের চাউনি বেশ শক্ত হয়ে উঠলো এবার।—'কোথ্‌থাও না।' বেদরদী গলায় সে বললো, 'এধারে তো নয় মশাই!'

'আর পাক্‌লা?'

'লেকে যদি আমি জাল ফেলি, তাহলে হয় তো তার দর্শন পেতে পারি'—কথাটা বলেই সে এক ছুটে আমার ত্রিসীমানা থেকে কেটে পড়লো। চক্ষের নিমিষেই।

ফিরতি পথে সেই বারোজনকে আবার ছুঁয়ে এলাম। শাক্‌লা কী, টের পাবার পর, কোথায় তা পাওয়া যায় জানার দরকার। ছ'জন তো সোজাই জানালেন যে, আমার পক্ষে তা পাওয়া সম্ভব নয়; তুজন বললেন যে, পুরীতে হয় তো পেতে পারি; তিনজন আমায় সেই ভুবনেশ্বর দেখালেন। একজন কোনো জবাবই দিলেন না।

কয়েকজনা মাছ ধরছিলেন। তাদের আশেপাশে ঘুরে ঘুরে টোপগুলো দেখলাম। শাক্‌লায় ভর্তি সব টিন। একজনের কৌটোয় কতকগুলো পাক্‌লাও যেন দেখা গেল।

তাদের সঙ্গে কথায় কথায় যা জানা গেল তা এই যে, এখানকার মাছ শাক্‌লা ছাড়া আর কোনো টোপ গেলবার পাত্র নয়। আর, এই শাক্‌লা কোথ্‌থাও কিনতে মেলে না। নিজের নিজের যোগাড় করে নিতে হয়। নিজের শাক্‌লা তাঁরা নিজেরাই যোগাড় করেছেন জানালেন।

কোথ্‌থেকে করেছেন কথাটা তুলতেই আর কোনো উচ্চবাচ্য নেই! যোগাড়ের কথায় তাঁরা যেন যোগে বসে গেলেন। নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের মতো ফাৎনায় ধীর-স্থির-নিবদ্ধদৃষ্টি প্রত্যেকেই তাঁরা কালা আর বোবা মেরে গেলেন যুগপৎ!

দিনদশেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করেও চিল্কার কারো কাছ থেকেই শাক্‌লা কিংবা পাক্‌লার কোনো পাত্তা মিললো না।

কিন্তু সেই মেয়েটির দেখা মিললো একদিন। মাছ-শিকারী বাবার কাছে শাক্‌লার টিন ধরে দাঁড়িয়েছিলো যে।

'কী! পেলেন খোঁজ শাক্‌লার?' হেসে সে শুধালো।

'না, কই আর পেলাম!' বলে আমার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম—'সে তো এখানে মেলে না।'

'সে—ই ভুবনেশ্বর!' বলেই মেয়েটি হেসে ফেললো।

'ইস্‌, কী পেল্লায় একটা মাছ যে তোমার বাবার পাল্লায় পড়লো সেদিন!' আমি বললাম: 'অত বড়ো মাছ ধরতে কেবল শোনাই যায় লোককে, কিন্তু নিজের চোখে দেখা যায় না কখনো।'

'বাবা ভারী মাছ ধরতে পারেন—ভালোও বাসেন খুব।'

'শাক্‌লা দিয়েই পাকড়ান তো?'

'হ্যাঁ, শাক্‌লা দিয়েই।' সায় দিলো মেয়েটি : 'শাক্‌লা ছাড়া মাছ ধরাই যায় না এখানে।'

'কিন্তু শাক্‌লা জিনিসটা—যাক গে—' বলে কথাটাকে আমি তালাক্‌ দিই। যে-রহস্যের উপকূলে কোনোদিন পৌঁছনো যাবে না, সে-উপকথায় গলা বাড়িয়ে কাজ কি?

'আজ তোমার বাবার সঙ্গে মাছ ধরতে যাওনি যে?' অন্যকথায় আসি।

'বাবা কাজে গিয়েছেন।' সে জানায় : 'ছুটির দিনেই আমরা মাছ ধরতে বেরুই কিনা। আপনি বুঝি ছুটিতে বেড়াতে এসেছেন এখানে? ছুটি পেলে অনেকেই আসেন তো!'

'ছুটি পেলে তাঁদের ছুটোছুটিতে পায়। নানান জায়গায় বেড়াতে যান। এক বেড়া টপ্‌কে অন্য বেড়াতে গিয়ে পড়েন।'

'আপনি তাহলে চেঞ্জে এসেছেন বুঝি?'

'চেঞ্জ! হ্যাঁ, চেঞ্জ তো বটেই। তা তুমি বলতে পারো অবশ্যি।' আমি বলি—'চেঞ্জের জায়গা তো বটেই এ।'

'চেঞ্জের জায়গা না ছাই!' মেয়েটি মুখ বাঁকায় : 'বাবা যদি একটা লম্বা ছুটি পায় তো আমরাও চেঞ্জে বেরুবো।'

'তোমরা চেঞ্জে যাবে? তোমরা আবার কোথায় যাবে চেঞ্জে? চেঞ্জের এমন জায়গা ছেড়ে? কলকাতার থেকে, কত জায়গার থেকে কত লোক হাওয়া বদলাতে আসছে এখানে।'

'ছুটি পেলে হাওয়া বদলাতে আমরা কলকাতায় যাই।' মেয়েটি জানায়। 'হ্যাঁ, চেঞ্জে যেতে হলে কলকাতাই।'

'অ্যাঁ? সে কি?' তাক লাগলো আমার। কলকাতা তো একটা বদ্‌-জায়গা, (যদিও সেটা আমার মত নয়,) সেখানে কি কেউ হাওয়া-বদলে যায়? তবে হ্যাঁ, কলকাতার কাছাকাছি আলিপুর একটা হাওয়া-বদলের জায়গা বটে। সেখানে নাকি ঘণ্টায় ঘণ্টায় হাওয়া বদলায়, আবহাওয়ার খবরে জানা যায়।

কিন্তু আসল আবহাওয়া তো নিজের মনে। সে তো মিনিটে মিনিটেই বদলাচ্ছে। সেই মন তো হাওয়ার মতোই উধাও। নিজের কেদারায় বসেই তার সঙ্গে উদ্দাম হওয়া যায়, তার জন্যে কেদারবদরী ধাওয়া করতে হয় না।

কিন্তু, নিছক এই হাওয়ার পেছনেই কি ছোটা আমাদের?

আমার ধারণা, তা নয়। হাওয়া বদলানো একটা ছুতো মাত্র, দেশভ্রমণের মতোই। তার উপলক্ষ ধরে' অন্যরূপ লক্ষ্যে পৌঁছনোই উদ্দেশ্য। অন্য কোনো রূপলক্ষ্য ভেদ করাই মতলব।

দেশে দেশে কত রকমের মিষ্টি আছে, তা মুখে দিতে, আর যত মিষ্টিমুখ আছে তা দেখে নিতেই দিগ্বিদিকে আমাদের এই দৌড়োনো। চোখের মিষ্টি আর মুখের মিষ্টির জন্যেই এই দিগ্বিজয়-যাত্রা আমাদের।

মুখের মিষ্টিদের চেখে দেখা আর মিষ্টিমুখদের চোখে দেখা—যদিও চোখের দেখাই কেবল! চলতে চলতে দেখা, দেখতে দেখতে চলা। আর দেখতে দেখতেই হারানো। একটাকে এর দেশভ্রমণের নাম করে সন্দেশ-ভ্রমণই বলতে হয়। আর

অন্যটাকে কী বলবো? যা চোখের রসনা থেকে মনের জিভ পর্যন্ত মিষ্টি করে দেয়, যাতে আপাদমস্তক আপ্রাণ আত্মা আমরা সজিভ হয়ে উঠি—অদ্ভুত এক রসের আস্বাদে নতুন করে নিজের অস্তিত্ব টের পাই—সেই অনির্বচনীয়তাকে যাই বলি না, শুধু তার জন্যেই দেশান্তরী হওয়া পোষায়।

আর, সত্যিকারের হাওয়া-বদল তো তাই! মনের আবহাওয়া বদলানো—বলছিলাম না? সত্যি বললে, মেয়েটি নেহাৎ মিছে বলে নি। এই হাওয়া-বদলের কাজ কলকাতায় যেমনটি হতে পারে, এমন আর কোথাও না। খালি আলিপুরেই নয়, কলকাতার সর্বত্রই ঘণ্টায় ঘণ্টায় আবহাওয়া বদলাচ্ছে। মিনিটে মিনিটেই। ঘরে না বসে কেবল পথে বেরুলেই হয়। মোড়ে মোড়েই আমরা বেঁচে বেঁচে উঠবো—নতুন করে' করে'। শুধু হাওড়ার প্ল্যাটফর্ম আর দমদমের এরোড্রোমেই না, গোটা কলকাতা দিয়েই সারা বিশ্বের শোভাযাত্রা!

বিশ্বশ্রীরা বিস্ময় আর শ্রী ছড়িয়ে দিয়েছেন সব পথে। অলিতে গলিতে তাঁদের লাবণ্য বিগলিত। বাবা গণেশ যেমন পার্বতীকে প্রদক্ষিণ করেই বিশ্বভ্রমণ সেরেছিলেন তেমনি, বিশ্বাস করুন, এই কলকাতায় ঘুরলেই বিশ্বপরিক্রমা। বিশ্বপরিদের পায়ের ছোঁয়ায় এখানের সব রাজপথ আজ রানীপথ। আমাদের পানিপথ। ওয়াটার্লু!

ছুনিয়ার খবর এখানেই পাবে, এই কলকাতাতেই। আর পাবে ছুনিয়ার খাবার! কিসের জন্যে দেশবিদেশে ধকল সইতে যাওয়া? দেশবিদেশের যা সার, তার সকলই কখনো না কখনো সামনের

এই পথ দিয়েই সার বেঁধে যাবে। এখানেই হাওয়া বদলাতে এসে এখানকার হাওয়া বদলে দিয়ে যাবে। নিমেষে নিমেষেই! অতএব, সেই হাওয়ার মুখে খাড়া থাকলেই তো হয়। বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে কাজ কি? বিশ্বের ভ্রমণপথেই আমাদের এই কলকাতা। বিশ্বের ভ্রম যদি কুড়োতে চাও, ঘুরো না কোথ্থাও, ভ্রাম্যমাণ এই কলকাতার ল্যাজে নিজেকে বেঁধে রাখো ভ্রাতঃ!

'আপনি বুঝি ছুটিতে মাছ ধরতে এসেছেন এখানে?'

'মাছ ধরতে? না না, মাছ ধরার জন্যে নয়—'

'তবে কি এই চিল্কা দেখতেই?'

'চিল্কা দেখতে? না, তাও না।' আমি বলি—'চিল্কা কি একটা দেখবার জিনিস? অন্তত আমার কাছে তো নয়। আমি যদি আগ্রায় যাই তো তাজমহল দেখতে যাবো না, যাবো মমতাজকে দেখতেই।'

'মমতাজ? সে কি বেঁচে আছে এখনো?' অবাক হয় মেয়েটি।

'এখন হয় তো 'অন্য নামে আছেন মর্তলোকে'। কিন্তু তাঁকে খুঁজে বার করতে আমার দেরি হবে না। তাঁর রূপ তাঁর মমতাই তাঁকে আমায় চিনিয়ে দেবে। আমি জানি।'

'কিন্তু তাহলে চিল্কা-ভ্রমণ তো সার্থক হলো না আপনার।' মেয়েটি হাসলো: 'এখানে কোনো মমতাজের দেখা পাবেন না আপনি।'

'কে বললে?···যদি বলি, পেয়েছি? এখানেই···এখনই পেয়েছি!···এই তো—সামনেই!···যদি বলি, তোমার দেখা পাবার জন্যেই এখানে আসা আমার।'

'আপনি আসুন আমার সঙ্গে—' বলে মেয়েটি আর একটুও দাঁড়ালো না। তাড়াতাড়ি হাঁটা লাগালো।

ঘাবড়াতে হলো আমায়। 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ!' বলে বিপথিক আমাকে রেগেমেগে কোনো কাপালিকের খাঁড়ার তলায় নিয়ে ফেলবে না তো?

কিছুদূর তার পিছু পিছু গিয়ে লেকের একটা পাঁকালো জায়গায় আমরা পৌঁছলাম।

'আপনি শাক্‌লা খুঁজছিলেন তো? ওই নিন শাক্‌লা।' সে দেখালো।

জল সেখানে গভীর নয়। কাপড় সামলে নেমে পড়লাম লেকে। মমতাজের মুখে—না-কী যেন নাম মেয়েটির—শাক্‌লাদের কুলকুষ্ঠি শুনতে শুনতেই। শাক্‌লা হচ্ছে সেই জাতের কাঁকড়া, সবে যার খোল গজিয়েছে, কিন্তু পুরোনো খোলস তখনো খসে নি, তার ফলে, তার পুরোনো খোলাটা ছাড়িয়ে ফেললেই নরম শাঁসালো নতুন খোলটা হাতে আসে। যা চিল্কার মাছদের পাতে পড়লে তারা আর লোভ সামলাতে পারে না। এই খোলছাড়ানো কাঁকড়া নাকি তাদের কাছে একটা 'ডেলিকেসি'।

খোলাখুলি সব জানিয়ে সে বললে—'এ খবর আর কাউকে যেন দেবেন না। এখেনে শুধু এই একটি জায়গাতেই এই শাক্‌লা মেলে। আর যা সামান্য হয়, তা আমাদেরই সারা বছরের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বাইরের লোকের সবাই যদি টের পেয়ে যায়—'

'পাগল! মাছের এই চার আমি কারো কাছে আরো পাচার

করি? কাউকে আবার দেখাই?' আমি ওকে ভরসা দিই: 'সেবিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

এক রুমাল শাক্‌লা নিয়ে পরের সকালে ছিপ হাতে লেকের ধারে আমি দেখা দিলাম। আর, মাছরাও আমাকে দেখা দিতে লাগলো। শুধু জলের তলা থেকেই না, মাটির উপরতলায় এসে। আমার শাক্‌লাকে ভালোবেসে তিন তিনটে হৃষ্টপুষ্ট মাছ ভেসে উঠলো একে একে। হেসে উঠলো আমার কাছে এসে।

নিজের কোচড়ের সঙ্গে তাদের বেঁধে নিয়ে ফিরছি, এক আগন্তুক এগিয়ে এলেন আমার সামনে—

'বাঃ, বেশ তো ধরেছেন মাছগুলি। খাসা!' আমাকে তাঁর অভিনন্দন জানালেন: 'কিসের টোপ দিয়ে ধরলেন এদের বলুন তো?'

'শাক্‌লার।' সগর্বে আমি বললাম।

শুনে যেন একটু হতভম্বই হলেন ভদ্রলোক। 'মশাই, আমি এখানে চেঞ্জে এসেছি, বেশিদিন নয়। এই—এই শাক্‌লা কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারেন?'

'শাক্‌লাই যে হতে হবে তার কোনো মানে নেই।' অনুকম্পান্বিত হয়ে আমি বলি: 'পাক্‌লা হলেও হয়। পাক্‌লাও চার হিসেবে মন্দ নয়।' ঐ বলেই আমি থামি। ওর বেশি আর চাড় দেখাইনে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শাক্‌লা আর পাক্‌লা। শুনে শুনে তো পাগলা হয়ে গেলাম মশাই। কিন্তু কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারেন? এই শাক্‌লা আর এই পাক্‌লা?'

'পাওয়াই যায় না।' বলতে আমি বাধ্য হই। 'অন্ততঃ ধারে কাছে তো নয়। পেতে হলে সেই ভুবনেশ্বর!'

আমিও ওঁকে সেই ভুবনেশ্বর দেখাই। তবে হ্যাঁ, যদি সাক্ষাৎ ভুবনেশ্বরীর দেখা মেলে—মনে মনেই বলি আমি—ত্রিভুবন ঘোরার পরে বরাত জোরে এখানেই যদি মিলে যায় দৈবাৎ—তখন এই শাক্‌লাকে এইখানেই অনায়াসে পাকড়ানো যায়!···আর, ভুবনেশ্বরী? ষোড়শীর পরের রূপটিই না?

প্রথম কুস্তিতেই মাত!

মিনির খোঁজে ডালুমাসির বাসায় গিয়ে শুনলাম সে গিয়েছে শালুমাসির কাছে। শালুমাসির ওখানে গিয়ে জানা গেল একটু আগেই কেটেছে সেখান থেকে। নিজের বাড়িতেই ফিরেছে খুব সম্ভব।

আবার রাস্তা ধরবো? ফিরে যাবো ডালুমাসির আস্তানায়? সারাদিন খালি এ-ডাল আর ও-ডাল করি, আর মজাটা ফস্কে যাক মাঝ থেকে? কাজেই ডাল থেকে পালায় নামা গেল, শালুমাসির কাছেই পাড়লাম—

'মিনি যখন নেই, তখন তুমিই কেন চলো না শালুমাসি? কুস্তি হচ্ছে, তার টিকিট পেয়েছি দু'খানা। যাবে তুমি দেখতে?'

'না বাবা! ওই সব গজকচ্ছপের যুদ্ধ কেউ আবার সখ করে দেখতে যায়? ধস্তাধস্তি, গুঁতোগুঁতি, মারামারি—রামোঃ! না বাপু, ষাঁড়ের লড়াই দেখতে আমার ভালো লাগে না।'

বলতে পারেন বটে শালুমাসি। বীরোচিত পুরুষদের বৃষতুল্য বলে তাচ্ছিল্য করতে তাঁর বাধা নেই। পুরুষ জাতটার ওপরে তিনি হাড়ে চটা। ষাঁড়ের মতো দূরে থাক; নিতান্ত অসার পুরুষও কোনোদিন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তাঁর ধার ঘেঁষতে পারেনি। তাঁর বিয়ের ফুল যে কখনো ফুটবে সে-আশা আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম। শালপ্রাংশু মহাভুজের কথাই নয়। কোনো

শাল্মলী তরুর শাখাতেও যে শালুমাসি কদাচ প্রস্ফুটিত হবেন সে-ভরসাও আমাদের ছিলো না।

কিন্তু ভেবে দেখলে, দাম্পত্যই কি নারীজীবনের সারাংশ না? ষাঁড়ভাগ বাদ দিলে কী থাকে তার? কলকাতার রাস্তাঘাট অষাঁড়, যদি বা ভাবা যায় কখনো, কিন্তু বৃষোৎসর্গ না হয়েই এক নারী-জীবনের শ্রাদ্ধ হয়ে গেল, কল্পনা করাই কঠিন। কিন্তু বিয়ের ষাঁড়াশী আক্রমণ, কোন মন্ত্রে কে জানে, বারংবার, শালুমাসি কাছে আসতে না আসতেই হটিয়ে দিয়েছেন। সেই শালুমাসি বৃষোৎসব দেখতে যাবেন···?

কিন্তু দেখতে হলো শালুমাসিকে। শালুমাসির অভাবে একটি পুরুষের জীবন মাগনা চলে গেলেও, একটা মাগ্‌না টিকিট ফেল্‌না যাবে তা কখনো হতেই পারে না। একটু লেট্ খেলেও কুস্তির কুরুক্ষেত্রে গিয়ে পড়া গেল।

কেল্লায় গিয়ে দেখলাম—পেল্লায় ব্যাপার! বিরাট এক মানবতার স্তূপ—মাংশপেশীর পাহাড়—দড়া দিয়ে ঘেরাও চার কোণা এক চৌকোর মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে। সেই বিপুল মাংসপিণ্ডের দুটো মাথা, চারটে বাহু, চার হাত, চারখানা পা আর এক জোড়া কোমর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আষ্টেপিষ্টে পরস্পরের সহিত আশ্লিষ্ট। আর ধরাশায়ী সেই স্তূপাকারটি একেবারে নট্‌-নড়ন-চড়ন নট্‌-কিচ্ছু নিশ্চল!

ধড়ের সঙ্গে একটা করে মুখও ছিলো বইকি। দু'মুখো সেই সমাবেশের দুটি মুখেই যাতনার চিহ্ন! তারই মধ্যে, সংশ্লিষ্ট একটি মুখে সেটা যেন আরো একটু প্রকট। ভারী মনমরা সেই মুখখানা।

মুখের এই বিষণ্ণতা কিন্তু আমার চোখে পড়েনি, শালুমাসির নজরেই ঠেকেছিলো। পুরুষমানুষের দৃষ্টি স্বভাবতই তেমন সূক্ষ্ম নয়, অনুভূতিও ভোঁতা, তাই মৌখিক এই সব লক্ষণীয় স্বতঃই তাদের চোখ এড়িয়ে। শালুমাসিই আমাকে ডেকে দেখালেন—! 'ছাখ্ তো তলাকার মুখটা একটু যেন কেমনতরো না? কি রকম যেন করুণ!'

করুণাপরবশ হয়েও আমি কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না।

'ওপরের দস্যিটা নিচের বেচারীকে পিষে মারছে! কেউ ওদের ছাড়িয়ে দিচ্ছে না কেন?' ব্যগ্র কণ্ঠেই শুধোলেন শালুমাসি।— 'রেফারী লোকটা কি রকম?'

'ছাড়াবে কি? কুস্তি করছে যে!' বললাম আমি।

'কুস্তি! একেই কি কুস্তি করা বলে! মেরে ফেললো যে ছেলেটাকে!'

ছেলেটাকে! চমক লাগলো আমার। এর মধ্যে ছেলেটা কে? দু'-ই পাঠ্ঠা জোয়ান, ইয়া তাগ্ড়াই চেহারা—সহজে মরার পাত্র নয় কেউ এদের। শালুমাসিকে আমি আশ্বস্ত করি—ছাখোই না কী হয়।

'না না! তুই বলিস কি? চোখের ওপর এ দৃশ্য কি দেখা যায়? দাঁড়া, আমি ওদের ছাড়িয়ে দিয়ে আসি। আমার এই ছাতার বাঁট দিয়ে এক ঘা লাগালেই...ওপরের খুনেটা ওকে ছেড়ে দিতে পথ পাবে না। এমন এক খোঁচা দেবো যে··· !'

ছাতা বাগিয়ে শালুমাসি উঠলেন। ছুটলেন কুরুক্ষেত্রের পানে। আসনের সারি পার হয়ে তিনি এগুলেন। 'বসে পড়ুন,

বসে পড়ুন !!' সোর উঠতে লাগলো পেছন থেকে। বাধ্য হয়ে তাঁকে পিছিয়ে এসে বসতে হলো আবার।

মাসিমার ডান পাশে যে-ভদ্রলোক বসেছিলেন তিনি বললেন—'আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ভাবনার কোনো কারণ নেই। ও কিছু না।'

'কিছু না! বলছেন কী? দেখছেন না, ওই জানোয়ারটা কেমন করে ওর গলা জাপটে ধরেছে। যদি দম আটকে যায়?'

'অত সহজে আটকায় না।' জবাব দিলো ভদ্রলোক।

এদিকে চারিধার থেকে সেই প্রপীড়িত লোকটির উদ্দেশ্যে উৎসাহ বর্ষিত হতে লাগলো। অযাচিত উপদেশের কামাই ছিলো না। 'এই যেদো, একদম আমোল দিস্‌নি লোকটাকে!'

'আছাড় মার্, তুলে ধরে মার্ এক আছাড়!'

'লাগা শালাকে তুই গোঁত্তা! ঠেলে ফেলে দে ওপরের দিকে।'

উপদেশগুলি আমার কাছে মনে হলো নিরর্থক। যেভাবে ওকে কাত করেছে আর যে কাতর ভাব যেদোর থেকে ব্যক্ত হচ্ছে তাতে এর কোনোটাই যে ও কাজে লাগাতে পারবে তা মনে হয় না। ঠেলা মারবে কি, যে ঠেলায় ও পড়েছে···আমোল দেয়া না দেয়ার কোনো কথাই এখানে ওঠে না।

'ওরা যে যা ধরে রয়েছে যদি তা ছেড়ে দেয়, তাহলে এক্ষুণি মিটে যায়', বাতলালেন শালুমাসি, 'দুজনে দুজনকে ছেড়ে দিক না।' বলেই তিনি গলা হাঁকড়ালেন: 'তলার লোকটা ওপরের ওই গুণ্ডাটাকে অমন করে আঁকড়ে আছে কেন? ছেড়ে দিলেই পারে!'

অযাচিত পরামর্শগুলি মাঠেই মারা যাচ্ছিলো। কুস্তিগিরের কেউ এসব কথায় কান দিচ্ছিলো না। তারা সেইভাবেই শুয়ে থাকলো। শুয়ে শুয়েই একটু করে নড়তে লাগলো। সেই একটুখানির নড়াচড়াতেই যে তাদের খুব বেগ পেতে হচ্ছে, বৃহৎ কষ্ট পোহাতে হচ্ছে, সেটা বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছিলো।

হঠাৎ ওদের একজনা—বিষণ্ণ গোছের যেটি—উপরের দিকে একটা টাল মারলো। আর তার টাল সামলানো শক্ত হলো উপরওয়ালার। পরমুহূর্তেই দুজনকে আমরা খাড়া হতে দেখলাম। দেখা গেল দুজনেই দুজনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

দারুণ হাততালি পড়ে গেল চারি ধারে। শালুমাসিও ছাতা নেড়ে নিজের সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

'তলার লোকটা যে এই লাফিয়ে ওঠার তাল খুঁজছিলো, শুয়ে শুয়ে তারই ফন্দি আঁটছিলো এতক্ষণ, তা আমি মোটেই বুঝতে পারিনি। টের পেলাম এতক্ষণে।' বললেন তিনি—'তখন থেকে ওকে আমি বলছি। তবু ভালো যে বোকচন্দর এতক্ষণে আমার কথাটা নিয়েছে।'

ওপাশের ভদ্রলোক বললেন—'আমি তো বলছিলাম আপনাকে—এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? দেখুন না একটু।'

'কেমন চক্ষের পলকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো!···অদ্ভুত না?' শালুমাসি যেন একটু গর্বভরেই তাকালেন পাশের দিকে।

'ও কিছুই না। ব্যালান্সের ব্যাপার।' তাচ্ছিল্যভরা জবাব এল ভদ্রলোকের।

'কিছু-ই না? আপনি নিজে একবার করুন দেখি। করে দেখান তো!' শালুমাসিকে উস্কে উঠতে দেখা গেল।

'যার কর্ম তারে সাজে' বলে আমি আরেকটা বাঙ্ময় কুস্তির গোড়াতেই জল ঢালি—'উনি করতে গেলে পারবেন কেন? তুমিই কি পারবে? আর আমি—আমি যদি আজ সখ করে কুস্তিগির সাজতে যাই, আমিই কি পারবো নাকি? সত্যি বলতে, আমার এ জীবনে তার চেয়ে বড়ো সাজা আর কিছুই হবে না।'

'আচ্ছা, কুস্তিটা কি পেশার পক্ষে ভালো?' সুর পাল্টে শুধালেন শালুমাসি।

'পেশীর পক্ষে যে ভালো তাতো দেখতেই পাচ্ছো।' শালু-মাসির চোখে আঙুল দিয়ে বললাম—'দেখছো না! পেশীর ভারে সারা দেহটাই ওদের নিষ্পেষিত।'

'আহা! কেমন পুরুষালী চেহারা!'

মাসিমার কথায়, বলতে কি, তাক লাগলো আমার। একটু আগেই না পথে আসতে উনি ব্যায়ামবীরদের যা নিন্দা করছিলেন—যে খোঁটা দিচ্ছিলেন ওদের! ব্যায়ামপুষ্ট দেহের পিণ্ডি চট্‌কাচ্ছিলেন যেমন করে'! বলছিলেন না যে ব্যায়ামের দ্বারা শরীর তৈরি করা ভালো, কিন্তু কোথায় থামতে হবে সেটা জানা থাকা চাই। দেহের গড়ন সুঠাম হলেই, ব্যস্, আর না! তার পরে আর বাড়াতে নেই। কিন্তু সেখানেই কি তারা থামে?

'এক একটা থাম্ না হয়ে ছাড়ে না।' আমি বলি—'শালুমাসি, যে গায়, তার মতোই যে দেহ বাগায়—তারা কোথায় থামতে হয় জানে না।'

শালুমাসি আর শরৎ চাটুজ্যের কথায় আমি একসঙ্গে সায় দিই।

'তবে আর বলছি কি? ভালোর ওপর আরো ভালো হতে গিয়ে বিতিকিশ্রি হয়ে ওঠে—ঘটোৎকচ হয়ে দাঁড়ায়!'

'বিতিকিশ্রি কী বলছো মাসি? তারাই যে বিশ্বশ্রী, কলকাতাশ্রী, হেদোশ্রী, বনহুগলীশ্রী...' আমি আপত্তি তুলি।

'বি—শ্রী!' এক কথায় তাঁর রায়।

সেই শালুমাসিকে এখন সুর পাল্টাতে দেখে অবাক হতে হলো। না বলে পারলাম না—'কিন্তু শালুমাসি! তোমার ব্যায়ামবীররা কোথায় লাগে এদের কাছে! একটা কুস্তিগিরকে কাটলে তিনখানা ব্যায়ামবীর বেরোয়।'

'তুই থাম্! ছাখ দিখি চেহারাখানা একবার! যেটা লাল জাঙিয়া পরে আছে, তাকেই দেখতে বলছি।' বললেন শালুমাসি। 'মনে হচ্ছে এখন যেন আরো লম্বা! আরো যেন ওর মাথা উঁচু হয়েছে। আরো যেন ফুলে উঠেছে ওর ছাতি! গায়ের বাদামী রঙটা খুলেছে যেন আরো।'

'আর সেই বিষণ্ণ মুখচোরা—চোরদায়ে ধরা-পড়া ভাবটাও আর নেই।' মাসিমাকেও একটা দ্রষ্টব্য আমি দেখাই।

কিন্তু আমার মুখের কথা পুরো না খসতেই পট এদিকে বদলে গিয়েছে। উঁচু মাথাওয়ালা সেই লম্বা লোকটিকে আরো লম্বমান দেখা গিয়েছে—পৃথিবীর সঙ্গে লম্বালম্বি! যেদোর প্রতিদ্বন্দ্বী যেদোকে ধরে তুলে—তুলে ধরে তিন পাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে। আর সে সশব্দে গিয়ে পড়েছে মঞ্চের অদূরে—আর, পড়েই একেবারে পাথরটি!

শালুমাসির মুখপটও বদলেছে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যই। অত বড়ো আছাড়টাও যেন যেদোর কাছে কিছুই নয়। ভ্রূক্ষেপ না করে তক্ষুণি সে উঠে দাঁড়িয়েছে—তড়িৎগতিতে। পড়বার পরমুহূর্তেই।

'আঃ, বাঁচলাম!' হাঁপ ছাড়লেন শালুমাসি—'লোকটাকে নড়তে না দেখে যা আমার ভয় হয়েছিলো।'

'ওতে ওদের লাগে না।' জানালেন পাশের ভদ্রলোক।—'কি করে পড়তে হয় ওরা জানে!'

'পড়তে জানাটা আবার কি রকম?' কিছুটা বিস্ময় কিছুটা বিরক্তি নিয়ে শুধোলেন শালুমাসি।

'মানে, পড়ার কায়দা ওদের রপ্ত করা,' বুঝিয়ে দিলেন তিনি: 'পড়বার সময় নিজেদের ওরা এলিয়ে দেয় কিনা! দেহের পেশীগুলো সব আলগা করে রাখে। সেইজন্যেই লাগে না।'

'আপনাকে বলেছে!' বলেন শুধু শালুমাসি। বেশ একটু গরম হয়েই।

তারপর মিনিট কয়েক ধরে দুজনের আছড়াপাছড়ি চলে। চলতে থাকে পরম্পরায়। এ ওঠে, ও পড়ে, ফের দাঁড়ায়, আবার পাড়ে অপরকে। এইভাবে ওদের পাড়াপাড়ি চলে—সারা মঞ্চ তোলাপাড় করে'। আবার কখনো বা দুজনে মিলে ঘাড়েগর্দানে এক হয়ে ঠেলাঠেলি লাগায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিম্বা বসে বসেই। কখনো বা জড়াজড়ি করে দুজনে গড়াগড়ি দেয় মেজেয়। লাল জাঙিয়ার মুখখানা ক্রমেই যেন আরো বিষণ্ণতর হয়ে ওঠে।

আর বেশ খুশিখুশিই মনে হয় সাদা জাঙিয়া-পরাটাকে। সে-ই যেন জিতছে এমনিতরো ভাব দেখাতে থাকে।

'আমার কী মনে হচ্ছে, জানো শালুমাসি'—বলি আমি একটু ভয়ে ভয়েই—'মনে হচ্ছে যে সাদাটাই লালটাকে সিধে করবে।'

শালুমাসি খানিক গুম্ হয়ে থেকে বললেন—'তাহলে সত্যি ভারী খারাপ হবে। যেটা দেখতে ভালো সে-ই যদি হেরে যায়··· সাদাটা ওর কাছে দাঁড়াতেই পারে না। কী বিচ্ছিরি দেখতে। ওর জিত হলে সেটা খুব অন্যায় হবে কিন্তু,···দাঁড়া না! ছাখ না! এক্ষুণি একটা কায়দায় ফেলে সাদাটাকে ও জব্দ করছে। ছাখ না তুই।'

নিজের সান্ত্বনাচ্ছলেই বললেন যেন কথাটা।

কিন্তু পাশের উপদ্রষ্টা ঘাড় নাড়লো—'আর পারবে না যেদো। হর্দার এখন নিজের প্যাঁচ কষছে। মারলো বলে ওকে।'

'তাহলে এক্ষুণি এই লড়াই থামিয়ে দিতে হয়।' শালুমাসি আঁৎকে উঠে বললেন—'প্যাঁচটা নিশ্চয় ওই বদমায়েসটা লুকিয়ে নিয়ে এসেছিলো। জাঙিয়ার মধ্যে কি আর কোথাও। কেন, কুস্তি শুরু হবার আগে কি ওদের ভালো করে এগজামিন করা হয় না? রেফারী কি আগাপাশতলা সার্চ করে ছাখে না সব? ভারী অন্যায় তো!'

কিন্তু এই অন্যায়ের সম্পর্কে, কিম্বা তার প্রতিবিধানে আমাদের মাথা ঘামাবার আগেই যেদো (ওরফে যদু?) বংশের মতোই লম্বা হয়ে পড়লো। আর উঠলো না। ওর ধ্বংসাবশেষকে ধরাধরি

করে নিয়ে গেল মঞ্চের কোণে। আর সাদা জাঙিয়াটা নিজের এক হাত আকাশে তুলে এগিয়ে এসে করমর্দন করলো যত্নর।

'কখন মারলো প্যাঁচটা?' শালুমাসি আলোড়িত হলেন: 'দেখলাম না তো? মেরে ধরে আবার আদর করা হচ্ছে!---আদিখ্যেতা!'

'পরাজিতের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করা নিয়ম কিনা!' পাশের ভদ্রলোক ম্লানমুখে জানান।—'নিজের দোষে হর্তুর কাছে হেরে গেল যেদোটা। এতদিনেও কিচ্ছু শেখেনি কুস্তির···'

'যেদোর কোনো দোষ নেই। সাদা জাঙিয়াপরাটাকে একবার তাকিয়ে দেখুন তো! যেন একটা ডাকাত। বাবা, কত বড়ো বুকখানা···হাতগুলো যেন হাতির শুঁড়···যেন এক ভীমভবানী! যেদো ওর সঙ্গে পারে কখনও? ওর কাছে ও তো ছেলেমানুষ।'

'ছেলেমানুষ! মোটেই ছেলেমানুষ নয়। যেদোর ফিজিকও কিছু মন্দ না। ওর গায়েও বেশ জোর। কেবল যদি কুস্তির আখড়ার অভিজ্ঞতা একটু থাকতো'···চোট্‌পাট্‌ জবাব এল ভদ্রলোকের—'কারো কাছে আরো একটু শিক্ষা পাওয়া দরকার ওর। যাকে বলে হাতে-কলমে শিক্ষা! কিন্তু কে যে ওকে শেখাবে!···জানেন, যেদো-হতভাগা আমার ভাই?'

বলে ভদ্রলোক এমনভাবে শালুমাসির দিকে তাকালেন যেন কলম-হাতে সেই শিক্ষককে এতদিনে তিনি চক্ষের সামনে পেয়েছেন। সেই দৃষ্টির সম্মুখে শালুমাসিকে কেমন যেন সলজ্জ দেখা গেল। যেন কুস্তির আখড়ার সমস্ত আখর মাসিমার জানা, আর সেই পরিচয়টা ভদ্রলোকের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে হঠাৎ।

'উনি আপনার ভাই ? তাই নাকি ?' আওড়ালেন তিনি শুধু।

'যাত্বর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো আপনার ?' বলেই ভদ্রলোক, মাসিমার উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই ইসারায় তাকে ডাকলেন। তাঁর পালোয়ান ভাইটি ততক্ষণে ভদ্রবেশে বদলে ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে আসছিলো মঞ্চের থেকে।

'আপনার মতো কোনো মহীয়সী মহিলা যদি ওর ভার নিতো...' তিনি নিশ্বাস ছাড়লেন—'তাহলে কী নিশ্চিন্ত যে আমি হতাম! কোনো শক্ত মেয়ের হাতে পড়লে মানুষ হতো হতভাগাটা।'

বলতে না বলতে ভায়ের দুর্লক্ষণটি এসে হাজির! লোকটার বুকের ছাতি, হ্যাঁ, দেখবার মতোই একখানা! আর, ছাতির প্রতি মাসির টান চিরকালের। কি সকাল, কি সন্ধ্যে, ছাতি ছাড়া তিনি এক পা-ও নড়েন না। কুকুর-বেড়াল, রোদ-বৃষ্টি, ষণ্ডা-গুণ্ডা, সবাইকে ঠাণ্ডা করতে ছাতির মতো নাকি আর কিছুই নেই। আমার কেমন সন্দেহ হয়, এমন একটা ছাতির মতন ছাতি হাতে পেলে শালুমাসি নিজের সাবেকটি বাতিল করতে একটুও হয়তো দ্বিধা করবেন না।

বেশিক্ষণ আমায় সন্দেহদোলায় দুলতে হলো না। যেদো ওরফে যাত্বর দাদা পরিচয় স্থাপনা করে দিয়েই কি এক জরুরী কাজে সরে পড়লেন। আর তার পরই শালুমাসির ছাতির মতোই যাত্বর বিস্তার হলো—'কাছেই ভালো একটা রেস্তোরাঁ আছে। আসুন না, সেখানে গিয়ে কিছু খাওয়া যাক। খেতে খেতে গল্প করা যাবে...কুস্তির পর খিদে পায় এমন!'

বলে ভদ্রলোক চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে। সপ্রশ্ন সে-চোখে কিন্তু আমার জন্য কোনো আমন্ত্রণী নেই। সমুত্তর এল শালুমাসির কাছ থেকে—'তুই তাহলে এখন যা। মিনি নিশ্চয় এতক্ষণে বাড়ি ফিরেছে। এখন গেলেই পাবি। ডালুকে আমার কথা বলিস।'

অগত্যা, রেস্তোরাঁর স্বাদ না নিয়েই আমায় যাতুর দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হলো। দাদাটি বলেছিলেন মিথ্যে না, কুস্তিগিররা পড়তে জানে। কি করে হাত-পা ছেড়ে পড়তে হয়, সে বিষয়ে তারা ওস্তাদ।

পরে শালুমাসির মুখ থেকে জানা গেল আরো। কেবল শুধু পড়তেই নয়, পাড়তেও ওরা বিচক্ষণ। কেবল যে কুস্তিতেই পাড়ে তাই নয়, কাউকে যদি তাক্ করে···মানে, তাকের থেকেও পাড়তে জানে। আবার ফুলের মতো তুলতেও ওদের তুলনা হয় না।

'তুই বলেছিলি যে, কুস্তিটা পেশীর পক্ষেই ভালো। সেকথা অবশ্যি সত্যি, কিন্তু পেশা হিসেবেও মন্দ না। জিতলে তো পায়ই, এমনকি, যারা হেরে যায়, তারাও টাকা পায় বেশ। আর কুস্তি করলে শরীর এমন শক্ত সমর্থ থাকে—গা হাত পা এমন জোরালো হয় যে···জানিস, আমার বিয়ের পরে ও আমাকে ঠিক একটা পালকের মতোই···'

বধূবরণের সময় আমার আড়াইমণী মাসিমাকে কোলে তুলে ঘরে নিতে বরপক্ষের এয়োরা যখন ইতস্ততঃ করছিলো, দু' মণের ওপর বইতে হলে দোমনা হওয়া বিচিত্র না! তখন শ্রীমান শালু মেসো

নিজেই এগিয়ে মাসিমার ঐ এক শ' আশী পাউণ্ড, হাল্কা একখানা পালকের মতোই অবলীলায় তুলে নিয়েছিলেন।

'তা শালুমাসি, সত্যি বলতে, তুমি ওর কাছে পালকই তো!'

আমি বললাম: 'এখন থেকে তুমিই তো ওর পালক। পালক কিংবা পালিকা যাই বলো।'

বৌ-এর ভাবনা

ভট্টশালীর আপিসে টিফিনের সময়টায় গেলাম। গিয়ে দেখি সে ভাবছে। মাথায় হাত দিয়ে নয় ঠিক, রুটির টুকরো মুখে করে'। টোস্টখানা দাঁতের ফোকরে নিয়ে কামড়াতে ভুলে গিয়েছে—

'কী ভাবছো হে এমন করে?' শুধালাম আমি।—'বৌ-এর কথা নাকি?'

'বৌ-এর কথাই।' সে মেনে নিলো। অকপটেই।

'আপিসে বসে বৌ-এর কথা?' আমি বললাম, 'বাসায় গিয়ে আপিসের কথা ভাবার মতোই অনুচিত। কাজের লোকের কাজ নয় মোটেই।'

'বৌ-এর কথা ভাবছিনে, বৌ-এর একটা কথা ভাবছি—' ভট্টশালী রুটিতে কামড় দিয়ে বললো,—'আপিসে আসার সময় কথাটা পই পই করে সে বলে দিয়েছিলো।'

'কিসের কথা?'

'তাই তো ভাবছি হে! কথাটা আদপেই আমার মনে পড়ছে না। তখন থেকেই ভাবছি কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিনে।'

'ভাবনার কথাই ত্রে তাহলে।'

'ভাবনার কথা বই কি!' বলে সে আবার ভাবতে লাগলো। ভাবিত তার সম্মুখে উন্মুক্ত টিফিনকেরীয়ারকে এমন অভাবিত পেয়ে আমি বিমুখ হয়ে বসে থাকতে পারি না।

'নাহক ভাবছো। তেমন কোনো কাজের কথা হলে কি ভুলতে পারতে? মনে থাকতো ঠিক।' বলে কেরীয়ারের দরাজখানা থেকে একটা রাজভোগ তুলে নিই।

'তুমি খাও। আমার মুখে মোটেই রুচছে না। কী যে বললো বৌ—' বলেই আবার সে অথৈ ভাবনার অকূলে গিয়ে পড়লো। একেবারে মুহ্যমান হয়ে।

ভাবনার কথা না হলেও কথার ভাবনায় পুটপাক হতে লাগলো ভট্টশালী।

'আচ্ছা, ভাবা যাক তো কী বলতে পারে সে—' বলে আবার-খাবোয় আমার দাঁত বসালাম—'কোনো চিঠিপত্তোর ডাকে ছাড়তে বলেছে কি?'

'তাহলে সেকথা মনে করিয়ে দেবার লোকের অভাব হতো না। পথে আসতে আসতেই পঞ্চাশজন আমাকে ডেকে বলতো।'

'কি রকম?'

'সে একরকম। ডাকে দেবার জন্যে একদিন বৌ একটা চিঠি দিলো আপিস বেরুবার মুখে। বার বার মনে করিয়ে দিয়েছিলো—যা তোমার ভোলা মন! চিঠিটা ছাড়তে যেন ভুলো না। গাড়িটা গ্যারেজে গিয়েছে, ট্রামে আসছিলাম···ট্রামেই একটা লোক গায়ে পড়ে জিগেস করলো—চিঠিটা ডাকে দিয়েছেন তো? চিনিও না লোকটাকে। আমি বললাম, কিসের চিঠি? কার চিঠি বলুন তো? সে বললো, তা বলতে পারবো না, তবে মনে হচ্ছে আপনার বৌ-এর কিম্বা—কিম্বা হয়তো—হয়তো বা আপনার শালীরও হতে পারে। বলে খালি একটু হাসলো। শুনে এমন

রাগ হলো আমার যে ইচ্ছে করলো এক চড়ে দিই লোকটার বাঁছুরে হাসি ঘুরিয়ে—'

'দাওনি তো সত্যিই ?' আমি বলি—'শালীর কথা তোলাটা তার ভালো হয়নি সত্যি কিন্তু ট্রামের ভেতরে পরচর্চায়—পরকে চড় মারলে শালীনতা ভারী ক্ষুণ্ণ হয়।'

'না, মারি নি। দেখলুম যে লোকটা বেশ ষণ্ডা গোছের—'

'ও বাবা! তাহলে তো তোমার ভদ্রশালীনতাই ক্ষুণ্ণ হবার ভয় ছিলো।'

'ছিলো বইকি। ট্রাম থেকে নেমে আপিস আসতে—ঐটুকু পথ তো—ঐ পথেই আরো জনাছয়েক ঐ এক কথাই আমাকে শুধোলো। কী মশাই, চিঠিটা ডাকে দিয়েছেন তো ? রেগেমেগে পোস্টআপিসে গিয়ে তক্ষুণি চিঠিটা ডাকবাক্সে ছাড়লাম। আরে বাপু, আমার চিঠি আমি ডাকে দি-না-দি তা তোদের কি ? তোদের এত ডাকাডাকি কেন ? এমন মাথাব্যথা কিসের ?'

'জরুরী চিঠি যে, জরু-র চিঠি কিনা।'

'জরুরী চিঠি, সে আমার জরু-র চিঠি—সে আমি বুঝবো। তোদের কি রে বাপু ? তোরা কেন ভেবে মরছিস ? তোদের কি বৌ ? কিন্তু বলবো কি ভাই, চিঠিটা ডাকে দিয়েও নিস্তার নেই। তখনো সবার মুখে সেই এক প্রশ্ন—! চিঠিটা কি ডাকে ছাড়া হয়েছে ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েছে—কবে—কোন কালে! এক শতাব্দী আগে। কিন্তু মশাই, আপনাদের জিজ্ঞেস করি, আপনাদের তো কাউকে আমি চিনিনে, আলাপও হয় নি কস্মিনকালে, আপনারা

কেন এমন করে গায়ে পড়ে—কিন্তু কে-ই বা কান দিচ্ছে আমার কথায়! শুনছেই বা কে!'

'ভারী আশ্চর্য তো!'

'আশ্চর্য বলে'!—আপিসে এসে পৌঁছনো পর্যন্ত প্রশ্নবাণের হাত থেকে রেহাই ছিলো না। সত্যি বলতে, যেমন রাগ হচ্ছিলো, তেমনি ভারী অবাকও লাগছিলো আবার। আমার বৌ আমাকে চিঠি ফেলতে বলেছে, তা দুনিয়াসুদ্ধু লোক টের পেলে কি করে'? রহস্যের কিনারা পেলুম আপিসে এসে। কোট খোলার সঙ্গে-সঙ্গেই। জামাটা চেয়ারের পেছনে যেই না রাখতে গিয়েছি, দেখি কি যে, কোটের পিঠে পিন দিয়ে আঁটা একটা কাগজ, আর তাতে লেখা—'দয়া করে এঁকে চিঠিটা ডাকে দেবার কথাটা মনে করিয়ে দেবেন।'

'অদ্ভুত তো!' ওর বৌ-এর বুদ্ধিমত্তার তারিফ করতে হয়।

'সত্যিই অদ্ভুত। স্বামীকে দিয়ে চিঠি ডাকে ফেলাবার এই কায়দাটা নাকি সে কোন বইয়ে না, বিলিতি কী ম্যাগাজিনে, কোথায় যেন পড়েছিলো। ইস্, সেদিনকার কথা আমি কোনোদিন ভুলবো না—' বলে ভট্টশালী পকেট থেকে কী একটা বের করে কপালের ঘাম মুছলো।

'বাঃ! বেশ বাহারে রুমাল তো! ও বাবা, পশমী রুমাল যে আবার।'

'রুমাল নয়, গলাবন্ধ। উলের। বৌ বুনেছে। আসবার সময় পকেটে গুঁজে দিলো।'

'রুমালের অভাব মোচনের জন্যেই বুঝি?'

'কিজন্যে কে জানে! গলায় বাঁধলে এমন গলা কুট কুট করে যে—'

'তোমার বৌ তো বেশ কূটনীতিক দেখছি। পাছে কোনো পরভা মেয়ে তোমার গলায় পড়ে তাই এই কূটনীতিটি তোমার গলায় বেঁধে দিয়েছেন।'

'বাঁধছে কে? পশমের এই সব গলাবন্ধ আমি ছ'চক্ষে দেখতে পারি না।'

'মেয়েলি চুল গাঁথবার একটি মায়াপাশ এটি। কোনো মেয়ে যদি এর গায় মাথা লটকায়, একটা না একটা চুল নির্ঘাৎ আটকাবে। তুমি তা ছ'চক্ষে না দেখলেও তোমার বৌ-এর চোখ এড়াবে না। পশমের এই এক ব্যায়রাম। এর কোনো উপশম নেই। এই গলাবন্ধের ভেতরে মাথা গলালে কি গ্যালে!'

'কেই বা মাথা গলাচ্ছে!' বলে সে মাথা নাড়ে। 'কিন্তু সেজন্যে নয়। কোন মেয়েই বা আমার ঘাড়ে পড়তে আসছে··· যাক, ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছো। আমার লেডি টাইপিস্টকে ডাকি। বৌ-এর কথাটা তো সে জানে। আপিসে এসেই তাকে আমি বলেছিলাম।'

টাইপিস্ট আসতেই ভট্টশালী শুধোলো—'এখানে এসেই যে কথাটা তোমায় মনে করিয়ে দিতে বলেছিলাম, কথাটা তোমার মনে আছে?'

'আপনার বৌ-এর কথা তো? হ্যাঁ, মনে আছে বইকি। আপিস থেকে যাবার সময়ে মনে করিয়ে দিতে বলেছিলেন।'

'কথাটা কী, বলো তো?' ভট্টশালী বলে—'কথাটা কিছুতেই মনে করতে পারছিনে।'

'কথাটা কী তা তো আপনি বলেন নি। বলেছিলেন যে, আপিস ছাড়ার সময় বৌ-এর কথাটা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে। শুধু এই কথাই।'

'ওহো! তাই তো বটে!' মনে পড়ে ভট্টশালীর—'তাই বটে! ভেবেছিলাম যে বৌ-এর কথা তুললেই কথাটা আমার মনে পড়ে যাবে। কিন্তু তখন থেকে কথাটা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করছি, কিন্তু কিছুতেই আর মনে পড়ছে না। আচ্ছা, তুমি যাও। আজ আর কোনো চিঠি ডিক্‌টেট্‌ করবার নেই। করতে ইচ্ছে করছে না।'

টাইপিস্ট গেলে সে আমার দিকে ফিরলো—'এমনি হয়েছে মেমারিটা। একেবারে কিচ্ছু আমার মনে থাকে না।'

'মেমারি তো বাড়ানো যায় বাপু! কোন বইয়ে যেন পড়ছিলাম যে চেষ্টা আর অভ্যাসে নাকি বাড়ে।' আমি বলি: 'মেমারি হচ্ছে বর্ধিত হবার জিনিস। তার অনেক ঐতিহাসিক নজির আছে। যথা—'

কিন্তু যথাযথ নজিরগুলি কথামতো আমার যোগায় না, মনে পড়ে না কিছুতেই, তখন ইতিহাসকে বাতিল করে আমি ভৌগোলিক প্রমাণ দাখিল করি: 'এই যেমন ধরো না, তোমার ওই মেমারি স্টেশন। দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে রয়েছে কোথায়? সেই বর্ধমানেই।'

কিন্তু সে-দৃষ্টান্তে কান না দিয়ে সে আমার দিকে চোখ পাকিয়ে

থাকে—'আচ্ছা, বৌমানুষে কী বলতে পারে, কিসের জন্যে বলতে পারে, তার কোনো ধারণা আছে তোমার ?'

'সাক্ষাৎ ধারণা না থাকলেও তা বলা যায়। স্বামীর কাছে বাড়ি—গাড়ি—শাড়ি এই সবই তো চায় বৌরা।'

'আজই তো চেয়েছে। কোথায় বেড়াতে যাবে বলে নিয়ে রেখেছে গাড়িটা। ট্রামে এসেছি—ট্রামেই বাড়ি ফিরতে হবে আজ। গাড়ি নয়, তবে হ্যাঁ। ঐ যে বললে—শাড়ি। শাড়ির কথা বলতে পারে বটে।'

'সুখ আর শাড়ি, পাখীর জগতে পৃথক হলেও এক জায়গায় এসে মিশে গিয়েছে।' আমি বাৎলাই : 'বৌ-এর গায়।'

'তবে চলো, শাড়িই কেনা যাক তাহলে। শাড়ির কথাই সে বলে থাকবে হয়তো। দেখে দেখে বেছে বেছে কেনা যাক কয়েকখানা—ওর পছন্দ হবার মতো। সেই সঙ্গে দু-একটা গয়নাও—নতুন ডিজাইনের কী বলো ?'

'তাহলে তো সোনায় সোহাগা! সোহাগের সঙ্গে সোনা। শাড়ির সঙ্গে সুখ—আবার, সুখের ওপর সোয়াস্তি। গোদের ওপর বিষফোঁড়া। তাহলে আর দেখতে হবে না।'

কিন্তু দেখতে হলো বেশ। অনেক দোকান ঘুরে নতুন ধরনের শাড়ি মিললো, যা ওর কিম্বা অন্য কারো বৌ-এর পরনে ও ছাখেনি!. আরো বহুৎ দোকান ঘুরে পছন্দসই গয়নার পাত্তা পাওয়া গেল। এমন গয়না, যা ওর মনের কষ্টিপাথরে কষে যাচাই করে জানা গেল যে, বৌ-এর মনের মতো হতে পারে। নেকলেসের প্যাকেটটা পকেটে

শাড়ির বাণ্ডিল বগলে বাজার থেকে বেরুলো ভট্টশালী। রাজার হালে।

পথের মোড়ে মনে পড়লো—কিছু ফুল নিলে হয় না?

রজনীগন্ধার ঝাড় আর কয়েক তোড়া ফুল কেনার পর এসেন্স-এর কথা ভাবলো সে। এসেন্স, সাবান আর গন্ধতেল কিনে সে তাকালো আমার দিকে—'আর কী কেনা যায় বলো দেখি?'

'কয়েক বাক্সো চকোলেট? আর খানকতক রোমান্টিক নভেল এই সঙ্গে। এই হলেই হ্যাঁ—চূড়ান্ত হয়ে যায়।'

হলোও চূড়ান্ত। এসেন্স আর সাবানের মোড়ক পুরলো সে এক পকেটে, অন্য পকেটে তেলের বোতলটা। বোতলটা পকেটের ভেতর থেকে মুখ বার করে রইলো। গয়নার খাপটা সে বুকপকেটে খাওয়ালো, এক বগলে নিলো বই-এর তাড়া অন্য বগলে শাড়ির কাঁড়ি, ফুলের তোড়াগুলো ধরলো ত্ব'হাতে। সব কিছুকে ধরা-বাঁধার মধ্যে এনে উল্লসিত হয়ে সে বললে 'হয়েছে। নিয়েছি সব। বাগাতে পেরেছি সবকটাই।'

আমি বললাম,—'উঁহু! রজনী এখনো বাকি।'

বলে আমার হাতের গন্ধমাদনটা ওর ঘাড়ে দিতে গেলাম।

'এটাকে যদি ঘাড় কাত করে নিতে পারো,' আমি বাতলাই: 'তাহলেই হয়। ঘাড়ের ফাঁকে আটকানো যায় অনায়াসে।'

'না, না। ঘাড় নয়, ঘাড়ে নয়।' ঘাড় নাড়লো ভট্টশালী: 'তাহলে আমার ঘাড় ভেঙে যাবে। আর, ঘাড় যদিও বা না ভাঙে, ফুলের ঝাড় আস্তো থাকবে না।'

'ফুলের ঘায় মূর্ছা যায় বটে কিন্তু ঘাড় ভাঙা যায় না।' আমি বললাম।—'ঘাড় পাতো কিম্বা তোমাকে পাততে হবে না, আমিই পাত করছি…'

বলে' রজনীর ঝাড়টা ওর গলার পাশে ছোঁয়াতেই সে ঘাড় কাত করে। মাথা পেতে নেয়। তৎক্ষণাৎ।

মাথা আর কাঁধ একাঠ্ঠা হয়ে ডাঁটগুলোকে আটকায়। যন্ত্রচালিতের মতোই।

ঘাড়ে আর ঝাড়ে একশা'! ঘাড়ের এই চরিত্র আমার জানা ছিলো। ঘাড় হচ্ছে স্বভাবতই স্পর্শকাতর। ঘাড়ের মতো সংবেদনশীল সমাজ-সচেতন জীব আর নেই। ঘাড়ের ধারে একটু শুধু ঠেকালেই হলো, অমনি সে নিজেকে পাত করবে—সেই উৎপাতকে আগলাবার জন্যে। ঘাড়ে-পড়া দায়কে সে ফেলতে পারে না, ঠেলতে পারে না; পরের হেতু নিজের মাথা হেঁট করতে তার দ্বিধা নেই। কারো ঘাড় ভাঙা যে সহজ সে এইজন্যেই!

ঝাড়ে আর বংশে সেই রজনীগুচ্ছ তার ঘাড়ে চেপে দেখতে যা হলো! কিন্তু বেশিক্ষণ দেখতে হলো না। সে পাশ ফিরতেই ওর ডাঁটের দিকটা আমার গালের ওপর ঝাঁট দিতে চাইলো। আর ফুলের দিকটা, যেটা পতাকার মতন মাথার পেছনদিকে ফেঁপে ছিলো, সেটা এক মেমের মুখের সব কারুকার্য এক আঁচড়ে মুছে দিয়ে গেল।

তার পরের মেমের আচরণের কথা আর আমি তুলতে চাই না।

'তোমার জন্যে আমার অপমানের চূড়ান্ত হলো।' বললো

ভট্টশালী। কাতরস্বরে—ঘাড় কাত করেই বললো।—'এখন দয়া করে' এই ফুলবাগানটা আমার ঘাড় থেকে নামাবে?'

'চূড়ান্তের কী হয়েছে এখন!' বলে আমি ঝাড়টাকে ওর কাঁধ থেকে ছাড়াই। যে-ফুল নাকি সারা দুনিয়াকে হাসায়, আশ্চর্য, তাকে কেউ কাঁধাতে চায় না।···শেষ পর্যন্ত···

রজনীগন্ধার ঝাড়টাই চূড়ান্ত করলো। সেটাকে ধরবার তার তৃতীয় কোনো হাত ছিলো না। অগত্যা, বুকের বোতাম আলগা করে ওর কোটের ভেতরে পুরে দিতে হলো।

গোটা ঝাড়টা ওর কোটরে ঢুকিয়ে বোতাম এঁটে দিলাম। ওর ঘাড় পেরিয়ে মাথা ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে রইলো ঝাড়টা।

তারপর আমরা ট্রামে উঠলাম। আমি উঠতাম না। কিন্তু ও কাকুতি করলে—'ট্রামের টিকিট কাটবো কোন হাতে? পকেট থেকে পয়সাই বা বার করবো কি করে? সব হাত তো জোড়া। তুমি যদি আমায় বাড়ি অব্দি না পেঁাছে দাও তো—'

দিলাম। টালিগঞ্জের এক টেরে ওর বাড়ি। ট্রামযাত্রীদের ঝাঁক থেকে রজনীগন্ধার ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে নাক গলিয়ে যখন ও নিজের গলির বাঁকটা দেখতে পেলো, তখন সন্ধ্যে উৎরেছে।

স্টপেজে নেমে ও নিজের পথ ধরলো। আমি ওর পিছু ধরলাম। বইগুলো সে ফেলতে ফেলতে চললো আর আমি চললাম কুড়োতে কুড়োতে। কুড়িয়ে কুড়িয়ে ফের ওর বগোলের গোলের মধ্যে এঁটে দিতে দিতে। বগোল-মালে জড়িয়ে পাগলের মতো, রজনীগন্ধার ঝাড়নে বাতাস ঝেঁটিয়ে সারা পথ মাতিয়ে চললো ও।

'এসো, এসো। বাড়ির মধ্যে এসো। আমার বৌ-এর হাতের চা খেয়ে যাও।' আমন্ত্রণ করলো ভট্টশালী।

ওর পেছনে পেছনে আমিও গেলাম। ভট্টশালী শাড়ির প্যাকেটগুলো বৌ-এর হাতে দিয়ে গয়নার কেসটা বের করতেই বইগুলো বগলের থেকে গলে পায়ের গোড়ায় ছড়িয়ে পড়লো। তেলের বোতলটা মেয়েটি আগেই নিয়েছিলো তার পকেট থেকে।

গায়ের কোট খুলে রজনীগন্ধার ঝাড়টা বার করলে ভট্টশালী। ফুলের তোড়াগুলো হাতে পেয়ে ওর বৌ তো খুশিতে আত্মহারা।

'আরো আছে, আরো আছে', বলে পুলকিত ভট্টশালী নেকলেসের বাক্সটা ওর হাতে দিতে যাচ্ছে, এমন সময়ে কী যেন ওর বৌ-এর নজরে পড়লো।

'ও মা, একি! গলায় কিছু নেই তো! একেবারে খালি দেখছি যে—!' আঁৎকে উঠলো ওর বৌ। ফুলের তোড়া খুলে পড়লো হাত থেকে। প্রফুল্লতা উপে গেল কোথায়!

ঝাড়খণ্ড অপসারণের পর ভট্টপল্লীর ঘাড়খণ্ড উন্মুক্ত হয়েছিল।

'আমার গলায় তো পরবার নয় গো, তোমার গলাতেই মানাবে—' আদরের স্বরে বলতে যায় সে।

'গলাবন্ধটা? সেটা গেল কোথায়? আপিস যাবার সময় তোমার পকেটে গুঁজে দিলাম যে?' শুধালো ওর বৌ।

'পকেটেই রয়েছে।' ভট্টশালী জানায়—'কোথায় আবার যাবে! যথাস্থানেই আছে।'

বৌ-এর ভাবনা

'আপিসে বেরুবার সময় এত পই পই করে তোমায় বলে দিলুম যে, ছ্যাখো নতুন হিম পড়ছে! ফেরার পথে ওটা তোমার গলায় জড়াতে যেন ভুলো না। আর তুমি কি না···!'

প্রাজাপত্য !

প্রিসিলা বললে, মেজমামা, গল্প লিখেটিখে তোমার কিছু হবে না। ওতে খালি পাতাই ভর্তি হয়, হাতের মুঠো ভরে না। তার চেয়ে তুমি বরং ঘটকালি করো। অনেক ছেলে অনেক মেয়ের সঙ্গে তো ভাব তোমার, এখন, তোমার ভাব যদি তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারো তো—

চারবারের বার ধার দিয়ে প্রিসিলা আমার অভাবমোচনের এই উপায় বাতলালো।

ঘটকালি করবো? কথাটা আমি ভাবলাম। ধরে বেঁধে ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে যদি বিয়ে বাধিয়ে দেয়া যায়, তাতে আমার অভাব দূর হোক বা না হোক, তাদের ভাবের দায় থেকে বাঁচা যায় অন্তত।

তাছাড়া, ভেবে দেখলে, গল্প লেখাটা কী? অপরের যতো দাগায় নতুন করে দাগা বুলোনো বই তো না! জীবনভোর যে-সব দাগা পেলাম, যে দগদগে ঘা কোনোদিন জুড়োলো না, প্রতিদান-মানসে বা প্রতিশোধ-স্পৃহার বশে, কাগজের পিঠে কালি ছড়িয়ে তাই দিয়ে অপরকে দাগী করে যাওয়াই তো? তাছাড়া আর কী?

তা, জীবনের সেই ঘটনাদের কালির আঁচড়ে না টেনে, ঘটকালির দ্বারা, ঐতিহাসিক আচরণে (পুনরাবৃত্তির নিয়মে)

অপরের জীবনে ঘটানো যাক না আবার? জীবনের যতো ঘটাকে ঘন করে সাহিত্যে না জমিয়ে সেই ঘনঘটা পরের জীবনে ফলানো যাক না!

'ঘটকালি করতে বলছিস তুই?'

'বলছিই তো। আর কিছু না হোক, আমার আইবুড়ো মাসিদের একটা হিল্লে হবে—উঠে পড়ে তুমি লাগো যদি।'

'এসো মশাই বললেই যে তোর মেসোমশাইরা এসে পড়বে তার কী মানে আছে? ঘটকালি করা কি এতই সোজা রে?'

'আহা, তা কে বলছে? ঘটকালি করা সোজা নয় তা আমি জানি। কিন্তু তুমি তো আর সেকেলের ধরনের ঘটক হবে না, তুমি এই প্রাচীন বিদ্যার আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নতুন টেকনিক বার করবে। মনস্তত্ত্বমূলক কায়দা যতো। মাসিদের নিয়ে চলবে তোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বিয়ে-ঘটানোর যদি কোনো নতুন পদ্ধতি আর সহজ উপায় তুমি বার করতে পারো তো—'

'আর বলতে হবে না। দু'দিনে আমি বড়লোক। কথাটা তুই মন্দ বলিসনি।'

'পরীক্ষা চালাবার মাল মশলারও তোমার অভাব নেই…। ভগবানের দয়ায় আমার মাসিদের তো গুণে শেষ করা যায় না।'

'তা বটে! গুণের শেষ নেই—যা বলেছিস! আর রূপের তো ছড়াছড়ি! আমার সাত মাসি মিলে, শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে, অন্তত সত্তরটি ভগ্নীরত্ন আমায় দান করেছেন। এরপর প্রজাপতির নির্বন্ধে মা ষষ্ঠীর কৃপা হলে এদের দৌলতে তোর মতো আরো কত—কত শত—ভাগনিরত্ন যে আমি লাভ করবো তা

ভাবতেই আমার বুক কাঁপছে!···তা হোক, ভয় আমি খাইনে, কিন্তু বোনে বোনে তো অরণ্য! এতজনের মধ্যে কাকে নিয়ে যে শুরু করা যায় ভাবছি তাই।'

'কেন, মঞ্জুমাসি কি রীতামাসিকে নিয়ে লাগো না কেন?'

'মঞ্জু? রীতা? ওরা কেন? ওদের তো নখদন্ত গজিয়েছে, খুঁটে খেতে শিখেছে ওরা। ওদের জন্যে আমি ভাবি নে। কখনো না কখনো কারো না কারো শাখায় ওরা মঞ্জরিতা হবেই।'

'ইলা মাসি কি শ্রীলা মাসিকে নিয়ে শুরু করো তাহলে? কিম্বা ছবি মাসি কি রুবি মাসিকে? আর কেউ না হোক, বিনি মাসি আর মিনি মাসি তো রয়েছেই।'

'না, বাপু বিনিময়-ব্যাপারে আমি রাজি নই। বিনি হচ্ছে যাকে বলে স্বাধীনচেত্রী—তাকে ঘাঁটাবার আমার সাহস হয় না। আর, মিনি-মাগনার কাজেও আমি নেই। তবে হ্যাঁ, শ্রীলা কি রুবির বিষয়ে ভেবে দেখা যেতে পারে।'

বিষয়টা বিবেচনা করবার। যদিও তা নিতান্তই পার্সোন্যাল। তাহলেও, মেয়ে পার করার ব্যাপারে আমার কোন মাসিমার পার্স কতটা দরাজ হবে, সময় ও শক্তির ক্ষতি-স্বীকারের আগে সেটা একটু খতিয়ে দেখার বই কি!

'তোর মামাতো মাসিদের তুই চিনিসনে প্রিসি। তাই মিনির কথা বলছিস। আমি যদি ডালুমাসির মেয়ের গতি করতে যাই তো আমার দুর্গতিতে কলকাতার শেয়াল কুকুর কাঁদবে।'

কিন্তু কাঁদবার পালা থাকলেও কাঁধ লাগালাম। মিনিকে নিয়েই পড়া গেল প্রথমে। আমার সব কাজিনের মধ্যে সে-ই

সবচেয়ে ঠাণ্ডা, সবার চেয়ে কম মেজাজী, তাকে নিয়েই লাগা যাক। নরম মাটির থেকেই পুতুল গড়ে, তার পরে প্রাণপ্রতিষ্ঠার কৌশলে সেই পুতুলই একদিন প্রতিমা হয়ে ওঠে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণাও প্রথমে গিনিপিগের ওপরেই। যে কামাতে শেখে, শিখতে চায়, গোড়ায় তাকে গাধা কামাতে হয়। গাধার গায় সে ক্ষুর বাগায়। যে সবে ক্ষুর ধরতে শিখেছে তার কাছে গাল বাড়াতে সাহস হবে কার? সে-সাহস শুধু গাধার আছে। পায় ক্ষুরওয়ালারা হাতে ক্ষুরওয়ালাকে দেখে ভয় খায় না। পালায় না। দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়। ধরে পাকড়ে যতো খুসি তাকে কামিয়ে দাও। প্রথম কামাবার প্র্যাক্‌টিশ তার ওপরেই। তার পরে তুমি দু' হাতে কামাও। ছাঁটাই করে যাও মানুষদের। চুল আর পকেট কাটতে থাকো সমানে। আগাপাশতলা সাফ করে যাও সবার। কুছ পরোয়া নেই।

আমারও তেমনি মিনির ধারে নিজের ক্ষুরের ধার পরীক্ষা করে একটু ক্ষুরধার হওয়া।

কো-এডুকেশনের কলেজে ভর্তি করে দেয়া হলো মিনিকে। সেকেলে ধরনে ঘরের কোণে পাত্রপক্ষকে এনে কনে দেখানোর পদ্ধতিতে তো কুলোবে না। সে-কায়দায় আর বিয়ে হয় না আজকাল, খালি সন্দেশ-খর্চা! আর যদি হয়েও যায়, বরপণ বেজায়! এখন মেয়ের বিয়ে দিতে হলে তাকে বর-শিকারে পাঠাতে হবে। স্বয়ম্বরের অশ্বমেধে। তারই প্রথম পৈঠে ঐটে—ঐ কো-এড। সেখানেও অবশ্যি বরপণ আছে, তবে অন্যরকমের। সেই মেয়েটিকেই বিয়ে করার পণ হবে বরের। ধর্মভঙ্গ পণ।

মেয়েটি যাতে নিজগুণে তাকে স্বীকার করে নেয় সেইজন্যেই খুন হওয়া।

অবশ্যি, কলেজে দেবার আগে মিনিকে একটু বাজিয়েছিলাম—'হ্যাঁ রে, তোর কি বিয়েটিয়ে করার মতলব আছে টাছে? না কি, আমাদের বিনির মতোই—'

'আহা, কোন মেয়ে আবার বিয়ে করতে না চায়।' মিনির জবাব পাওয়া যায়।

'যেসব মেয়েরা নাচায়। নাচিয়ে বেড়ায় ছেলেদের। তারা বিশেষ কাউকে বিয়ে করতে চায় না। তা, তুই সে-দলের নোস তো?'

মিনি চুপ করে থাকে।

'ডালুমাসি যে ধরনের সেকেলে'—আমি এবার মগ্‌ডাল থেকে পাড়ি: 'তাতে তোর যে কোনো কালে বিয়ে হবে তা তো আমার মনে হয় না। কনে দেখিয়ে বিয়ের দিন তো নেই আর। বর পেতে হলে এখন ঘরের কোণ ছেড়ে বেরুতে হবে। অবাধে মিশতে হবে ছেলেদের সাথে। তোর কি কোনো ছেলেটেলের সঙ্গে ভাব টাব আছে না কি?'

মিনি ঘাড় নাড়ে।

'তবেই তো মুস্কিল। তা, তুই কি ছেলেদের সঙ্গে মিশতে চাস? চাস কি যে, ছেলেরা তোর পিছনে পিছনে ঘুরুক? ঘুর ঘুর করুক?'

'কোন ছেলেরা?'

'এই মরেছে! কোন ছেলেরা কিরে? সে কি আমি তোকে

বলে দেবো? যেসব ছেলেকে তোর ভালো লাগে, তোকে ভালো লাগে যেসব ছেলের—তারাই মনে কর না! তোর সঙ্গে যারা মিশতে চায়—তোর সঙ্গ যাদের খুব মিষ্টি লাগে?'

'মিশলে তো কোনো ছেলের সঙ্গে? মিশতে দিলে তো মা?' সে গুমরোয়।

'তবে আর কি করে হবে? জলে না নামিলে কেহ শেখে কি সাঁতার?' অকূলপাথার দেখি।—'না মিশলে তুই মিষ্টি কি তেতো আর-সবাই তা টের পাবে কি করে'? নিজেকে সামলে—নিজের হাতে রেখেই তোকে একটু মিশ্রিত হতে হবে বই কি! চেনা-চিনির পর একটু মেশামেশি হলেই ছেলেরা গলে যায়। গলে জল হয়। তখন সেই জলে আর মিশ্রিতে মিশে গুলে গেলেই সর্বৎ! হলুদরঙা চিঠি। শুভবিবাহ।'

চেনা-চিনির রস যাতে দানা বেঁধে মিশ্রি হয়—তার পরে পাণিগ্রহণে আবার তরল হয়ে চিরকালের সর্বতে দাঁড়ায়—দানাপানির ব্যবস্থা হয় মিনির (এবং সেই-মিনিঅলের, মিনির বর হয়ে যিনি আসবেন) সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ওকে কো-এডের কলেজে ভিড়িয়ে দেয়া হলো।

কয়েক দিন পরে মিনি আসতেই তাকে শুধালাম—'কিরে, কেমন পড়ছিস?'

'প্রেমে?' মিনি আর সে-মিনি নেই। চোখেমুখে স্মার্টনেস্। —'এখনো তেমন স্থবিধে হয়নি।'

'ছেলেদের সঙ্গে ভাব হলো?'

'হয়েছে। ছু'-একজনের সঙ্গে।'

'মিশতে পেরেছিস বেশ সহজভাবে ?'

'আহা, মেশা যেন কতই কঠিন! জানো, একটা ছেলে আমায় শুধিয়েছিলো তাকে আমার কেমন লাগে।'

'কী বললি তুই ?'

'আমি বললাম বেশ লাগে।'

'কী হলো তাতে ? মানে, তোর কথায় তার অবস্থাটা কেমন হলো ? প্রতিক্রিয়াটা কিরকম দেখলি ?'

'যেন গলে গেল বলে মনে হলো। সিনেমা দেখার কথা পাড়তে যাচ্ছিলো, কিন্তু তারপরেই আমি বললাম যে সব ছেলেকেই আমার বেশ লাগে।'

'ইস ! এইটে বলে ভালো করিসনি।'

'কেন বলো তো ? আমার একথার পর ছেলেটা কিরকম মুষড়ে গেল যেন। সিনেমার কথাটা আর পাড়লো না তার পর। এমনটা কেন হলো বুঝলাম না।' বললো মিনি।

'এ-ছেলেটা ফসকে গেল তোর।' আমি বললাম : 'যে-মেয়ের সব ছেলেকেই ভালো লাগে সেই নির্বিচারিণী ভালোবাসিনীকে কোনো ছেলেই ভালোবাসে না। যা বলেছিস বলেছিস, এমন কথা আর কাউকে যেন বলিসনে।'

'তাই বলো।...আগে বলতে হয়।' বলে' মিনি চলে গেল।

তার কয়েকদিন-পরে এসে খবর দিলে সে—'এক তরুণ অধ্যাপকের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছে মেজদা।'

'বটে বটে ?' আমি উৎসাহিত হই। সত্যিই এটা সুখবর। অধ্যাপকরা, শুনে থাকি, সহজেই নাকি ভাবালু হয়। ছাত্রীর

প্রতিই বিশেষ করে'। আর তেমন হলে তাকে নিজের পাত্রী না করে সহজে ছাড়ে না।—'কেমনতরো ভাব শুনি একবার ?'

'বেশ গদ্‌গদ ভাব। মানে আমার নয়, সেই প্রোফেসারের।' বলে' মিনি তার সারাংশ জানায়—'এমনকি, আমি তাকে—তার কাছে বিয়ের কথাও পেড়েছিলাম আজকে।'

'বলিস কি ? তুই নিজের থেকেই, অ্যাঁ ?' আমি আঁতকে উঠি। গাছে কাঁধ না দিতেই এক কাঁদি নামিয়ে আনবে, মিনির মতো মেয়ের কাছে এতখানি আমার আশার অতীত।

'আহা, আমার বিয়ের কথা কি ? তার বিয়ের কথাই জানতে চেয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কি বিয়ে করেছেন ? সে বললে, না। আমি বললাম, করেননি কেন ? তাতে সে জবাব দিলে, যে-মেয়েটি এলে আর সব মেয়ে মুছে যায় সেই-একটিকে পাইনি, তাই। তখন আমি শুধালাম, তা, সেই-একটির খোঁজ কি এতদিনেও পাননি ? সে বললে, পেয়েছি। পেয়েছি বলেই যেন মনে হচ্ছে।'

'বাঃ! এই বার মনে হচ্ছে একটাকে তুই গাঁথতে পারলি বোধহয়!' আমি একটু উৎসাহ দিই।

'পেয়েছেন যদি তো সে-মেয়েটিকে বিয়ে করছেন না কেন ? তারপর আমি জানতে চাইলাম। তাতে যেন সে একটু হকচকিয়ে গেল বলে মনে হলো। আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে, ক্লাশ নিতে হবে বলে সে চলে গেল চট্‌পট্‌।'

'নাঃ, এ-হতভাগাও দেখছি তোর ফাৎনা ছিঁড়ে পালালো।' আমি বাতলাই।

'না, না। পালায়নি। বিকেলে ফের করিডরে দেখা হলো যে। তখন আমি তাকে বললাম, বুঝেছি, আপনি কোনো তন্বীর প্রেমে পড়েছেন। নিজের দিকে চেয়েই বললাম।'

'নিজের দিকে চেয়ে?' আমার দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়।

'না, না, তার দিকে চেয়েই। তবে কথাটা আমার নিজের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বলা তো? শুনে এমন একটা চোখে তাকালো সেই প্রোফেসর, তাকিয়েই তীরবেগে চলে গেল এক দিকে।'

'যেদিকে দু' চক্ষু যায়?'

'না, না, ঠাট্টা নয়। বলো না, এটা কি তার প্রেমে পড়ার লক্ষণ নয়?'

'উঃ! উঃ!!' অব্যক্ত যাতনায় আমি কাৎরে উঠি—'ইচ্ছে করছে তোকে একটা চড় লাগাই। কিন্তু নেহাৎ তুই পরির মতন, আর পরিচর্চা জিনিসটা পরচর্চার মতোই খারাপ। তাই তোর গায় আর হাত তুললাম না। কিন্তু—কিন্তু এমনি করেই কি হাতের লক্ষণ পায় ঠেলে? এ যে একবারই শুধু ঠেলা হয়েছিলো—সেই ত্রেতাযুগেই—শ্রীমতী শূর্পনখার আমলে।'

বাস্তবিক, এই বোকা মেয়েকে নিয়ে আমি কী করবো? শিক্ষা দিয়ে কি এই নাবালিকাকে মানুষ করতে—মেয়েমানুষ করতে পারবো কোনোদিন?

'ক্লাশ পালিয়ে আজ এক ফোর্থ ইয়ারের ছেলের সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছিলাম, জানো?' মিনি একদিন এসে শোনালো: 'ইস, ছেলেগুলো এমন অপদার্থ হয়!' আমি শুনে যাই চুপ করে। 'আস্তো একটা গবেট। হল্ থেকে বেরুতেই দেখি বৃষ্টি। ট্যাক্সি

গিস্ গিস্ করছে সিনেমাটার সামনে, কিন্তু একটাকেও যদি ডাকতে পারে ! যেটাকেই ইসারা করছে সেটাই কোনো সাড়া না দিয়ে চলে যাচ্ছে অন্য লোকের কাছে। দেখে দেখে আমার এমন রাগ হচ্ছিলো। কতক্ষণ অমন করে দাঁড়িয়ে থাকা যায় ? এদিকে ভিজে ভিজে গিয়ে ট্রাম ধরতে হলেই হয়েছে ! আমি আর দাঁড়ালাম না। একটু এগিয়ে যেই না হেঁকেছি 'ট্যাক্সি !' অমনি একটা এসে গিয়েছে সামনে। দ্যাখো, কত সহজে আমি ট্যাক্সি ডেকে দিলাম, কিন্তু ছেলেদের কৃতজ্ঞতা বলে কি কিছু আছে ? সারাটা পথ ট্যাক্সিতে মুখ ভার করে রইলো।'

'এটা তুই ভারী ভুল করেছিস।' বলতে আমি বাধ্য হলাম। 'তোর উচিত ছিলো ওর ওপর নির্ভর করে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা। এমনকি, দরকার হলে বৃষ্টিতে একটু ভেজাটাও মন্দ হতো না। মেয়েদের অসহায়ভাবটাই ছেলেরা পছন্দ করে—তাদের সেই নির্ভরতায় তারা ভারী ভরসা পায়। তোদের আনাড়িত্বই হচ্ছে তোদের নারীত্বের পরাকাষ্ঠা। তার আওতায় এসে ছেলেরা নিজেদের পুরুষ বলে বুঝতে পারে। নিজের পৌরুষ বোধ করে' গর্ব অনুভব করে। সেই-অসহায় লতাটিকে ঝড়ঝাপ্টা থেকে রক্ষা করতে এগোয়—নিজের শালপ্রাংশু মহাভুজে চিরকালের আশ্রয় দিতে চায়।'

'আহা, কী আমার মহাভুজ !' ভুজঙ্গিনীর মতো ও ফোঁস করে ওঠে।

'এতে হলো কি, তুই হয় তো ট্যাক্সি পেলি কিন্তু ছেলেটিকে হারালি। চিরদিনের মতোই। যার কাছে খেলো হতে হয়

সে-মেয়েকে কখনো ছেলেরা ক্ষমা করে না। ছায়াচিত্রে ফের নিয়ে যাওয়া দূরে থাক, আর কোনোদিন সে তোর ছায়াও মাড়াবে না।' আমি বলে দিলাম।

'বয়েই গেল!'

'শোন, ওরকম না। ও করলে তোকে চিরকাল আইবুড়ি থাকতে হবে। আমাদের মাতু মাসির মতোই। ও নয়, ছেলেদের কাছে আপনা থেকেই একটু নিচু হতে হয়। তাতে কোনো লজ্জা নেই, অপমানের নেই কিছু। সেইটেই তো মেয়েদের আর্ট। সত্যি বলতে মেয়েরাই হচ্ছে কর্ত্রী। তারাই সব করিয়ে নেয়, কিন্তু ছেলেদের মনে হয় যেন তারাই সব করছে। এতে ছেলেদের অহমিকা চরিতার্থ হয়, তারা গৌরব বোধ করে। ভাবটা হয় তাদের, তুমি মোরে করেছো সম্রাট—এই গোছের। আর এই ভাবের ঘোরেই—বেঘোরে তারা মারা পড়ে। মনে করে যে হ্যাঁ, এতদিনে একটা মেয়েকে—মেয়ের-মতো-মেয়েকে আমি ধরতে পেরেছি। আসলে সে নিজেই যে ধরা পড়েছে তা সে টেরই পায় না। এইখেনেই মেয়েরা সুপার-আর্টিস্ট। বিধাতার সগোত্রই বলতে হয়।'

'অত কাণ্ড আমি করতে পারবো না।'

'যে-বিয়ের যে-মন্তর। মন্তর ঠিক ঠিক না আওড়ালে কি বিয়ে হয়?' বলে আমি মন্ত্রণা দিই। ছেলেদের বাগিয়ে আনতে হলে কী হচ্ছে দস্তুর। কক্ষনো নিজের থেকে আগিয়ে যেতে নেই। আরো পঁচিশটা মেয়ে যদি সেই ছেলেটাকেই কাড়তে চায় তাহলেও তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে নেই। কারো সঙ্গে কোনো কমপিটিশন

না। নিজের জায়গাটিতে নিজেকে নিয়ে থাকো। নিজেকে শোভন করে রাখো। ছেলেটিই আপসে আ-যায় গা। তখন যো আপ্সে আতা উসকো আনে দেও। তার সঙ্গে কথা বলো, মিষ্টি করেই, কিন্তু দুটি একটি। বেশি কথা বলতে নেই। তাদের কথার ওপর কথা তো নয়ই। তার কথায় হাসো—অবশ্যি যদি সেটা হাসবার কথা হয়। যদি তুমি ঠিক বুঝতে পারো যে সেটা হাসির কথাই। কিন্তু তার কোনো সিরিয়স কথায় কদাপি হেসো না। ঠিক জায়গায় ঠিক মতন হাসতে জানলে কেবল হাসির দ্বারাই কাজ হাসিল হতে পারে।

কোনো ছেলের ওপরে কোনো বিষয়ে কখনো টেক্কা মারতে নেই। তাদের কাছে নিজের গুণগান করো না! রূপের গান তো নয়ই। তর্কাতর্কির থেকে সতর্ক থাকবে। বলে' কর্তব্য-অকর্তব্যের তালিকা আমি আরো বাড়াই : তোমার ছেলেবন্ধুদের কথা তার কাছে কক্ষনো বলতে যেয়ো না। মেয়েবন্ধুদের কথাও নয়। তোমার মাসিভাগ্য আর কাজিন ভ্যাগাবণ্ডদের কথা ভুলেও তুলো না কখনো। তোমার কোনো সুশ্রী বন্ধুনীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ো না তার। বিয়ের তালি দু' হাতেই ভালো বাজে, তার মধ্যে বেশি হাতের আমদানি হলে হাতাহাতি বেধে যায়। পই পই করে আমি তাকে তালিম দিই।

'এত কাণ্ড করে বিয়েয় আমার কাজ নেই।'

'কাণ্ড করতে বলছে কে? কোনো কাণ্ড নাই করলি। লঙ্কাকাণ্ড কিস্‌কিন্ধ্যা কাণ্ড—এসব তো বাদ দিতেই বলছি আমি। ছেলেদের সঙ্গে সহজভাবে মিশলেই হয়। সহজ হতে পারলে

সমস্তই সরল হবে। বোনের মতোই মিশলি না হয়। নায়িকার পার্ট নিতে বলছে কে? আমাদের সঙ্গে—তোর হতভাগ্য কাজিনদের সঙ্গে যেমনভাবে মিশিস ঠিক তেমনি। দেখবি খুব সহজেই ভাব জমে গিয়েছে। বোন থেকে বেড়ে বন্ধু হয়ে উঠেছিস কখন যে! মিশতে মিশতেই দেখবি। আবার হয় তো দেখতে পাবি, বন্ধুত্ব ধুয়ে মুছে বৌ হয়ে দাঁড়িয়েছিস কবে আবার!'

'পরের সঙ্গে বোনের মতো ব্যবহার করে বন্ধুত্ব পাতিয়ে এত কাণ্ড করেই যদি বৌ হতে হয়, তাহলে আমার কাজিনদের কাউকে বিয়ে করলেই তো পারি? যাদের কাছে আমি অলরেডি বোনের মতো—বন্ধুর মতোই?'

'তা পারিস। কাজিন-ম্যারেজ তো চালু হয়েছে আজকাল। তিন আইনে রেজেস্ট্রি করে বিয়ে হয়। কিন্তু তোর কাজিনদের মধ্যে তেমন সুপাত্র কে আছে? সহজবধ্য পেয়েছিস কাউকে?'

'ভাবছি।'

'ভাববার কিছু নেই। কাজিনরা কোনো কাজের নয়। আমার কাজিনদের সবাইকে আমি জানি। তার যুবকাংশ বিলকুল বাজে। আর্ধেক তার জু, আর বাকি অর্ধেক বক বক। খালি খেলার কথা নিয়েই মেতে আছে। বিয়ের যোগ্যই নয়। শোন্, যাদের সঙ্গে মিশতে বলছি···মিশতে মিশতেই দেখবি, বন্ধুত্ব থেকে বধূত্বে পৌঁছনোর মাঝ ধাপটা কত সহজেই পেরিয়ে গিয়েছিস হঠাৎ। সব বাধা সরে গিয়েছে কখন! দেখবি যে, একদিন ওরই মধ্যে একটি ছেলে এসে তোর কাছে প্রস্তাব করছে—'

'কোনো কু-প্রস্তাব?' মিনি তেতে ওঠে : 'তাহলে তক্ষুনি আমি ঠাস করে এক চড় লাগাবো।'

'আহা, কু-প্রস্তাব কেন? চড়াবার কোনো কথা নয়। খারাপ কথা না। আচ্ছা, প্রস্তাব না বলে প্রস্তাবনাই বলা যাক। বিলিতি কোর্টশিপে যাকে প্রোপোজ করা বলে থাকে। বিয়ের ভূমিকাও বলতে পারিস। ছেলেদের দিক থেকে ভূমিকাই, কিন্তু মেয়ের দিক থেকে একেবারে ইতি। যাত্রা শেষ। ধর্ কোনো ছেলে এসে তোকে বললো—তুমিই আমার জীবনে একটিমাত্র মেয়ে! এ জীবনে শুধু তোমাকেই আমি ভালোবেসেছি। তুই তার জবাবে কী বলবি?'

'মিথ্যুক কোথাকার! ইয়ার্কি দেবার আর জায়গা পাওনি?'

'সর্বনাশ! তাহলেই হয়েছে। তবেই হয়েছে তোর বিয়ে! না না, ওকথা নয়।' আমি হাঁ হাঁ করে উঠি: 'অমন কথা কি বলতে আছে? কোনো কথাই তোকে বলতে হবে না। কিচ্ছুটি না বলে লাজুক মেয়েটির মতোই চুপটি করে থাকবি শুধু। তাহলেই হবে।'

মিনি চুপটি করে থাকে।

'না বলাতেই বলা হবে। অ-কথাতেই তখন অকথিত কত কথা মুখর হয়ে উঠবে। যে-কথা তুই গুছিয়ে বলা দূরে থাক ভুলেও কখনও বলতে পারবিনে, চাইবিও না বলতে। ছেলেরা ব্রীড়াময়ীকেই চায়, ক্রীড়াময়ীকে নয়। মনে কর, ছেলেটা যদি বলে, লক্ষ্মীটি, বলো না, তুমি কি আমাকেই শুধু ভালোবেসেছো? আমিই কি তোমার জীবনে সব প্রথম? তুই তার জবাবে—'

'বলবো যে, না। শুধু তোমাকেই? তা কি কখনো হতে পারে?'

'সেরেছে। মাটি করলো সব। এত কাণ্ডের পর—এত পরিচ্ছেদ পড়ে—অবশেষে উপসংহারে এসে···নাঃ, এমন করলে হবে না। তোর কিচ্ছু বলে কাজ নেই। তুই শুধু পূর্ণদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকিস। তাহলেই হবে। যা বলার তোর চোখই বলবে। চোখের মতো চোখা বলিয়ে আর নেইকো। আর, সেও তার চোখ দিয়েই শুনবে তো? যে-কথা তুই স্বপ্নেও বলতে চাস না, তার চোখ সেইসব কথাই শুনবে। চোখের মতন বোকা শ্রোতা আর হয় না।'

মিনি হাঁ করে আমার কথা শোনে।

'এখন ধর, ছেলেটি যদি আমাদের স্বজাত না হয়, অন্য প্রদেশেরই হলো হয়তো, তাহলে কী হবে? তার সঙ্গে, ধরা যাক, হিন্দুমতে, ব্রাহ্মমতে, খৃস্টানমতে কি বৌদ্ধমতে কোনোমতেই বিয়ে হতে পারে না—তখন? তখন কী করা যাবে? কোন মতে বিয়ে হবে?'

'কেন, ছেলেমেয়েদের নিজেদের মতে। তাদের মত থাকলেই হলো।'

'আহা, সে-মত তো রয়েছেই। তাহলেও সমাজসম্মত কিছু একটার দরকার নেই? তখন শুধু তিন আইনের রেজেস্ট্রি-মতেই বিয়ে হতে পারে। সেই মতলবেই ধর, ছেলেটি তোকে বললো, কবে আমাদের বিয়েটা রেজেস্ট্রি করে পাকা করা যায় বলো তো? তুই তখন কী উত্তর দিবি তার?'

'এক্ষুণি। এই দণ্ডে।'

'হ্যাঁ। এতক্ষণে বলেছিস বটে একটা কথা! কথার মতো কথাই।' আমি সাবাস দিই।

'আমি তো কখন থেকেই বলতে চাইছি! তুমিই খালি আগড়ম বাগড়ম বকছো। কিন্তু বাপু, এত ভণিতা কিসের জন্যে? এত ঘুরিয়ে নাক দ্যাখানো কেন? সোজাসুজি বললেই হয়।... তা কখন যাচ্ছো রেজেস্ট্রী আপিসে?'

'অ্যাঁ?' শুনেই না আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ি। এমন ম্যাকসিমাম্ খাটুনির পর এই মিনিমাম্ লাভ—ভাবতেই আমি জ্ঞান হারাই।

সখী-সংবাদ

'হ্যালো! কে? কে কইছে? শুনতে পাচ্ছিনে কিছু...' মঃ ফোন ধরে বলে: 'সবিতা? স্মরিতা? স্মরীতা আবার কে? কে? ও, রীতা? রীতু...তুমি! তাই বলো!. আমাদের রীতু! ভাবতেও পারিনি যে তুমি...'

'কাল এসেছি ভাই কলকেতায়। সেই পাটনার থেকে।' স্মরীতার স্মৃতি-সংহিতা: 'এক যুগ পরে এলাম। তোর ফোন নম্বরটা তাহলে ঠিকই দিয়েছিলো ইলা। তোদের এই নতুন বাসাটা কোথায় বল তো...তোর ওখানে যেতে হলে...'

'আসবি? এখনই আসবি? আয় না, আজ ছুটির দিন তো। আপিস টাপিস নেই। একলাই রয়েছি। চলে আয়। না না, গঙ্গাযাত্রা করতে হবে না। সে বাড়িতে আমরা নেই আর। এখানে আসতে...? দাঁড়া, বলে দিচ্ছি তোকে। কোত্থেকে ফোন করছিস বল তো? দেশপ্রিয়র কাছ থেকে? তাহলে এইট-বি বাস্ ধরে আসতে পারিস। কিম্বা টু-এ বাসে চেপে এস্‌প্ল্যানেডে নেমে...না, সেটা একটু ঘুরে হবে। বরং একটু এগিয়ে এসে হাজরার মোড়ে যদি তেত্রিশের বাস-এ উঠিস তো বেশ হয়। সেই সবচেয়ে ভালো। ঐ বাস্‌টা আমাদের বাসার পাশ দিয়ে যায় কিনা...'

'কোনখানটায় আছিস বললি না?'

'হাতীবাগান। না না, গ্রে স্ট্রীটের হাতীবাগান না রে। ইটালি—হাতীবাগান। এন্টালি মার্কেটের পাশ দিয়ে যে রাস্তা গিয়েছে তাই ধরে একটুখানি এগুলে কতকগুলো সরকারী বিল্ডিং দেখতে পাবি, আচ্ছা···এক কাজ কর না। দেশপ্রিয় থেকে সোজা বালিগঞ্জ ইস্টিশনে যা, সেখান থেকে ট্রেন ধরে শেয়ালদায় এসে তারপরে দশ নম্বরের বাসে···তাহলে আবার ইটালি মার্কেটের কাছে নেমে বাস্ বদলাতে হবে তোকে। না, ঐ তেত্রিশ নম্বরই সবচেয়ে সুবিধের। অবশ্যি শেয়ালদাতেও তেত্রিশের বাস্ পাবি। বুঝলি ?'

'একেবারে জলের মতন। যাচ্ছি আমি। ট্যাক্সিতেই যাচ্ছি।'

সকালের চান সেরে বেরুতেই রীতার ফোনটা এল। এখন একটুক্ষণের মধ্যে সাজগোজ করে তৈরি হতে হবে। ট্যাক্সি হাঁকিয়ে রীতু তো এসে পড়লো বলে'। চট্‌পট্ ভালো শাড়িটা বার করে পরে নেয় মঞ্জুশ্রী, ব্লাউজের সঙ্গে মানিয়ে। স্নো-পাউডারের প্রসাধন না সারতেই দরজার কড়া নড়ে ওঠে—

দশ মিনিটও হয়নি, রীতা দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে !

'ওমা ! এসে পড়েছিস যে।' মঞ্জুশ্রী ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে রীতুকে। কয়েক মুহূর্ত জড়াজড়ির পর দুজনে ওরা সরে দাঁড়ায়। তাকায় এ ওর দিকে। দুইজনেই দুজনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছাখে ভালো করে'।

'ওমা ! রীতু, তুই তো একটুও বদলাসনি। সেই রকমটিই রয়েছিস দেখছি। কলেজে পড়তে যেমনটি ছিলি—'

'তুইও তো ভাই তেমনিই আছিস। সেই তন্বী বহ্নিশিখাটি! মাঝে যে এক যুগ কেটে গিয়েছে তার একটুও ছোপ তো পড়েনি তোর কোথাও—। কেবল ঐ চোখের কোণেই যা একটু—তা ওকে কাজল-রেখা বলে চালিয়ে দেয়া যায়। কি করে এমনটি আছিস ভাই, বলবি আমায় ?'

'তুই আর বলিস নে। দেখছিস আমার এই রোগা প্যাঁকাটি দেহ ? গায়ে কি একটুও মাংস লেগেছে অ্যাদ্দিনেও ? সেই হাড় ক'খানাই রয়ে গিয়েছি। কি করলে যে তোদের মতো একটু মোটা হওয়া যায়···গায়ে একটু গত্তি লাগে···'

'আর মোটা হয়ে কাজ নেই। মোটা হওয়ার সুখ কত! এই যে রোগা রয়েছিস সেই ভালো—সত্যি, শুধু এইজন্যেই তোকে আমার হিংসে হয়।'

'বোস তুই। আমি চায়ের জলটা চাপিয়ে আসি।'

'আচ্ছা, অ্যাদ্দিন ধরে একটা চিঠি দিসনি কেন বল তো ? তোর কোনো খবর না পেয়ে আমি ভাবলুম বুঝি তুই বিয়েটিয়ে করে কোন দূরদেশে চলে গিয়েছিস—' রান্নাঘর থেকে মঞ্জুর আওয়াজ আসে।

'বিয়ে ? বিয়ে করবে স্নীতা ?' স্মরীতা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে : 'নিজের স্বাধীনতাকে আমি সবচেয়ে বেশি মূল্য দিই জানিস ? কারো খাতিরেই কোনোদিন তা বিসর্জন দেবো না।'

'আমারও ঐ কথা!' মঞ্জুও গুঞ্জরিত হয় : 'আমার কাছেও কেউ আজ অব্দিও বিয়ের কথা পাড়েনি ভাই। বন্ধু হতে চায় সবাই। বাঁধা পড়তে রাজী নয় কো কেউ।'

'যা বলেছিস। তা বলে আমি যে একেবারেই বিয়ে করবো না এমন কোনো ধনুর্ভঙ্গ পণ আমার নেই। আই-সি-এসের আশা অবশ্যি আর করিনে, তবে যদি কোনো উপমন্ত্রীকে—'

'তেমন পেলে কোন মেয়ে না লুফে নেবে? তবে এখনো পুরুষ জাতির ওপর তোর আস্থা রয়েছে দেখছি। বিশ্বাস হারাসনি তাহলে। কিন্তু ভাই, আমার কথা যদি বলিস তো কলেজে পড়তেও যেমন দেখেছিলাম ছেলেদের, এখন আপিসে চাকরি করতেও ঠিক তেমনিই দেখছি। এক নম্বরের চালিয়াৎ ওরা। আর মিথ্যুক যদ্দূর হতে হয়।'

'তা তুই বলতে পারিস। তোর মতো যে মেয়ে একবার চোট খেয়েছে, তার পক্ষে পুরুষজাতির প্রতি বিশ্বাস হারানো আশ্চর্য নয়।'

'চোট? আমাকে চোট দেবে এমন ছেলে এখনো জন্মায়নি! কি করে যে নিজেকে বাঁচাতে হয় তা আমার জানা আছে। অন্ততঃ, বিপদের এলাকায় এলেই আমি বুঝতে পারি। সরে পড়ি ঠিক সময়ে। তোর মতন না।'

'আমার মতন, তার মানে?'

'বলতে কি, আমার তো বেশ ভাবনাই ছিলো তোকে নিয়ে। ভয় হতো এই বুঝি তুই নিজেকে ডোবালি। খুইয়ে বসলি সব। বিপদ বাধালি একটা। যেমন ভাবে তুই ছেলেদের সঙ্গে মিশতিস—'

মঞ্জু চায়ের কেটলি, কেকের ট্রে নিয়ে আসে। টিপয়ে রাখে। মাখম মাখায় রুটিতে।

'মিশলে কী হয় ? তোর যেমন ! যতই মিশি না, যেভাবেই হোক, ভাব করে নিজের ভবিষ্যৎ খোয়াবো তেমন মেয়ে আমি নই। কোনো ছেলেই আমার কিছু করতে পারেনি। সেদিকে আমি বাবা, ভারী হুঁশিয়ার ছিলুম···না না, অত করে মাখম মাখাসনে আমার রুটিতে। মাখম আমার বারণ। বাঃ, এ-কেক্‌গুলি তো বেশ রে ! খেতে বেশ তো ! কিন্তু আধখানার বেশি খাবার আমার সাহস হয় না। ক্রীমকেকের দিকে তাকাতেও আমার মানা। তবে একখানা খাই ভাই ? কেমন ? একটা খেলে তেমন কিছু ক্ষতি হবে না, এমন কী বলিস ?'

'তোর আবার কী ক্ষতি হবে ? যা মুটিয়েছিস, এর ওপরে এক আধ সের বাড়লে আর কী তোর যায় আসে ?'

'তা বটে !···আহা, তোর মতো যদি দেহ পেতাম আমি। আর আমার মতো মুখ। ঐ ছিপছিপে চেহারায় এই মুখশ্রী—যদি এরকমটা হতো ? কিন্তু হায়, মানুষে যেটি চায় তা কি আর হয়ে থাকে ? তা কি সে পায় কখনো ?'

'তোর মুখের সেই আঁচিলটা গেল কোথা রে ? কি করে দূর করলি বল তো ?' রীতার মুখশ্রীতে নজর দিতে গিয়ে মঞ্জুশ্রীর চোখে পড়ে—'বিচ্ছিরি সেই কালো তিলটা—তিল না বলে তাকে তালই বলা উচিত। সেই তালটা দেখছিনে তো।'

'সেই আমার বিউটি স্পট্ ? হঠাৎ কি করে উঠে গেল একদিন ! তিলে তিলে উঠছিলো—টের পাইনি মোটেই। বিলিতি একটা ক্রীম মাখার জন্যেই মনে হয়। আহা, সেটা গিয়ে এত মন খারাপ হয়েছিলো আমার—তা কী বলবো তোকে !'

'তা, মন খারাপের কথাই বটে!' মেনে নেয় মঞ্জু: 'না দেখে আমারই কেমন মন-কেমন করছে। ওই তিলটা—বা তালটা যাই বল—ওটা থাকলে কেউ দু' দণ্ড তোর মুখের দিকে তাকাতে পারতো না!'

'তোর ঐ চোয়াল-উঁচু হাড়বেরকরা মুখের দিকে যদি তাকাতে পারে—' রীতা ফোঁস করে ওঠে। তিলোত্তমা সে না হতে পারে কিন্তু কারু চেয়ে নিজেকে তিলাধম ভাবতেও সে নারাজ।

'ঐখেনেই তুই আমায় হারিয়েছিস ভাই! তোর গলার তলায়—ত্রিস্তর ছবির মতোই ঐ যে—ইংরেজিতে যাকে বলে ডবল চিন্, কিন্তু তাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে তোর—কী বলে ওকে? গরুর হলে তো গলকম্বল বলে, তরুণীর হলে কী বলা যায়? তোর ঐটের জন্যেই আমার হিংসে হয়—'

'হিংসে করে কি করবি! বিধাতা তোকে শুঁটকি করেছে—'

'আর তোকে মুটকী করেছে! না না, খেয়ে ফ্যালো...' হাঁ হাঁ করে ওঠে মঞ্জু: 'না ভাই, সরিয়ে রেখো না। খেতে হবে কেক্‌গুলি। নষ্ট করা চলবে না অমন করে। না খেলে তো ফেলাই যাবে সব—কী আর হবে ওগুলো? বেড়ালেও তো খাবে না!'

'অত করে বলছিস যখন, তাহলে খাই। বেশ কিন্তু খেতে ভাই এই কেক্‌গুলি। আহা, কতদিন পরে ফের আবার ছুটিতে মিলেছি। সেই আগের দিনগুলির কথা মনে পড়ছে—যখন আমরা কলেজে পড়তাম—আচ্ছা মঞ্জু, সুহৃদকে তোর মনে পড়ে? সেই সুহৃদ—সেই যে রে? ফর্সাপানা ছেলেটা? বছরখানেকের

সিনিয়র ছিলো আমাদের। কলেজ থেকে বেরিয়ে যে পাইলট হতে চলে গেল?'

'পাইলট সুহৃদ? তা, এক আধটু পড়ে বইকি।' মঞ্জুশ্রী ঈষৎ রাগের আরক্তিতে মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে: 'লম্বা চৌড়া পুরুষের মতো চেহারা ছিলো বটে তার!'

'তুই তো তার প্রেমে পড়েছিলি!'

'কে বললে?'

'সেই বলেছে—যার প্রেমে পড়েছিলি।'

'তোকে বলতে গিয়েছে!'

'শুধু কি এই কথাই? আরো যা বলেছে—না, সেকথা কাউকে বলা যায় না।'

'কী বলেছে শুনি?'

'তুই নাকি একদিন দুপুরে তার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলি—আর তখন সে···অবশ্যি তখন সে পাইলটের কাজ করতো আর তার বৌ ছিলো তখন বাপের বাড়ি—আর তুই গিয়েছিলি তার ফ্ল্যাটে।'

'গেলেই বা! বন্ধুর কাছে বন্ধু বুঝি যায় না?' মঞ্জু প্রতিবাদ করে: 'আর তার বৌ বাপের বাড়িই থাক, কি জাহান্নামেই যাক —তাতে আমার কী! পুরানো কলেজ-মেটের কাছে কি কারো যেতে নেই কো?'

'তাই কি আমি বলেছি? এমন সময়ে তার বৌ নাকি বাপের বাড়ি থেকে এসে পড়লো হঠাৎ? আর তুই তখন···তোকে তখন নাকি সে লুকিয়ে রেখেছিলো একটা আলমারির পেছনে?'

'এই কথা বলেছে সুহৃদ?'

'শুধু বলা! তার কী হাসি! বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়ছিলো সুহৃদ! তুই ভারী মুস্কিলে পড়েছিলি, না রে? সেই আলমারিটার পেছনে দাঁড়িয়ে···সেখানে ছিলো আবার হাজার হাজার আর্সোলা। নেংটি ইঁদুরও ছিলো নাকি গোটাকয়েক!'

'সু—সুহৃদ বলছে এইসব?'

'এই জন্যেই বলছিলুম রে মঞ্জু! এইসব কলির কেষ্টদের একটুও আমার বিশ্বেস নেই।···তাদের সঙ্গে যে মেশে, সে আহাম্মোক!'

'সু! সুহৃদ! সে বললে···ইস, ঘরটা কী গরম হয়েছে।' মঞ্জু উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দেয় ভালো করে: 'একটু ফাঁকা হাওয়া আসুক ঘরে।'

'গরম! গরম কী বলছিস রে? হু হু করে পাখা ঘুরছে মাথার ওপর? অবাক করলি তুই! সুহৃদ একটা হতভাগা। ওর কথা ভেবে তুই মন খারাপ করিসনে। তুই আমার প্রাণের বন্ধু। বন্ধু বলেই বললুম তোকে। অন্য কেউ হলে কি বলতুম?'

'বলে ভালোই করেছিস। এই সেদিন—সেদিনও সে···যাক গে। তার কথা থাক।'

'তবে হ্যাঁ, বলতে হয় তো বলীনকে। অমন ছেলে আর হয় না। যেমন ফেইথফুল তেমনি—' স্মরীতা স্মরণ করে: 'তেমনি একটা মানুষের মতো মানুষ! পাগলের মতো ভালোবাসতো আমায়। স্টীমার পার্টিতে সেই যে গেলুম একদিন···সেদিনের কথা তোর মনে আছে? আমার কিন্তু এখনো যেন চোখে ভাসছে। রেলিং ফস্‌কে কি করে যে পড়ে গেল মাঝগঙ্গায়···আর চিরদিনের মতোই তাকে আমি হারালুম।'

'তারপর কি তার সঙ্গে তোর দেখা হয়নি ?'

'কি করে হবে! উঠতে পারলে তো ? ডুবে মারা গেল যে বেচারা। কিন্তু অমন একটা সাঁতারু, ডুব-সাঁতারে বাহাদুর, এক ডুবে হেদো গোলদীঘি পেরুতো—সে কিনা ঐভাবে গঙ্গায় ডুবে মলো !'

'অবাক হবার কী আছে ? তা কি আর মরে না ?'

'আমিও তাই ভাবি। কার যে কিসে মরণ থাকে বলা শক্ত। আর এমনিই বুঝি হয়ে থাকে। যে সাপ খেলাতে ওস্তাদ সে-ই সাপের কামড়ে মরে। ডুবুরিরাও মারা পড়ে ডুবতে গিয়েই। বলীনের মতো সাঁতারে নাম-করা—যে নাকি কতবার বাজী ধরে গঙ্গা পেরিয়েছে, সেও শেষে স্রোতের টানে ভেসে যায়।'

'ভাসিয়ে যায় বল।'

'ভাসিয়ে যায়—কী বলছিস ?'

'তার মানে, শুধু ভেসেই তো যায়নি, তোকেও ভাসিয়ে গিয়েছে সেই সঙ্গে।'

'তা যদি বলিস তো, বলীনের কথা ভাবলে—' স্মরীতাকে ভাবাতুর দেখা যায়—'ওর কথা মনে হলে এখনো আমার—'

'তুই যদি কিছু মনে না করিস তো বলি।' মঞ্জুশ্রী বলে।

'বল না, কী বলবি !'

'বলীনের কথাই বলছিলাম। কিন্তু ভাই বলতে আমার ভরসা হয় না, তুই যদি মনে আবার কষ্ট পাস।'

'কষ্ট পাবো কেন। বল তুই।'

'সেদিনের ঐ দুর্ঘটনার পরই তো স্টীমার-পার্টি ভেঙে গেল।

তক্ষুণি তো ফিরে এলুম আমরা? মন ভার করে যে যার বাড়ি ফিরে গেলুম সবাই। তার একটু পরে—একটু পরেই বলীন এল —আমাদের বাড়িতে। ভিজে বেড়ালটি হয়ে।'

'বলীন এল? বলীন? তুই বলিস কি?'

'বলীন এল গঙ্গা সাঁতরে—ন্যাতা জোব্‌রা হয়ে। তখন তো আমরা বাগবাজারের ঘাটের কাছে থাকতুম? আমার মামার বাড়িতেই থাকতুম আমি। তোর নিশ্চয় মনে আছে বাড়িটা? বলীনের সঙ্গে একবার না দু'বার তুই গিয়েছিলি না সেখানে? গঙ্গার শোভা দেখতেই গিয়েছিলি—যাসনি?'

'গিয়েছিলুম তো। বেশ মনে আছে। গঙ্গার ওপরেই ছিলো বাড়িটা।'

'আমার ঘরে বসে—সেই চিলকোঠার ঘরটিতে—আমার শাড়ি পরে বলীন আমাদের ছাদে তার জামা কাপড় শুকোতে লাগলো। ভাগ্যিস, মামা তখন বাড়ি ছিলো না।'

'কিন্তু বলীন—! তুই তো কোনোদিন একথা বলিস নি আমায়?'

'কি করে বলি! ও যে আমাকে দিয়ে দিব্যি গালিয়ে নিয়েছিলো। ওর গা ছুঁয়ে দিব্যি গেলেছি, যাতে তোকে না বলি কক্ষণো—'

'কিন্তু কেন? কেন?'

'কেন! তুই যে বললি ওই! পাগলের মতো ভালোবাসতো তোকে। সত্যিই সে তোকে খুব ভালোবাসতো। তাই তোর মনে যাতে কোনো ঘা না লাগে—তোকে কোনো ব্যথা দিতে সে

চায়নি। সেইজন্যেই সে অমনি করে নিজের সলিল-সমাধি ঘটিয়ে ঐভাবে তোর জীবন থেকে একেবারে মুছে যেতে চেয়েছে।'

'কিন্তু কী দরকার ছিলো তার মুছে যাবার? আমি—আমি কি—আমি তো তাকে —'

'জানি আমি রীতু। আর সেও জানতো। কিন্তু সে কী বললে জানিস? বললে মঞ্জু, মেয়েটা বড্ডো ভালোবাসে আমায়—তা জানি, কিন্তু ওকে কি করে জীবনসঙ্গিনী করি বলো! যে মেয়ে—যে-মেয়ের—'

বলতে গিয়ে আট্‌কে যায় মঞ্জুর।

'বল না কী বলেছিলো?'

বন্ধুর আবেদন মঞ্জুর করতে তবুও যেন তার বাধে। একটু ইতস্ততঃ করে বলে—'কাউকে বলবিনে বল? বলীন বলছিলো—বলীন বললো যে মেয়ের নাক ডাকে···যে-মেয়ে অমন করে নাক ডাকায় তাকে কি করে বিয়ে করা যায় বলো!'

রবি অস্ত গেল

'ঘটকালি আমার দ্বারা হবার নয়।' প্রিসিলাকে আমি বললাম—'তার কথায় তাই করতে গিয়ে আমার প্রায় কালীঘাট হবার যোগাড়।'

'কালীঘাট ? সে কী মেজমামা ?'

'কালীঘাট, মানে, আমার ওয়াটার্লু, আর কি!' আমি ঘাট মানি।—'ওরফে জলাঞ্জলিও বলতে পারিস।'

'জলাঞ্জলি ?'

'না। ও-কম্মো আর নয়। এ জীবনে না।'

'কেন, কী হয়েছে ?'

'কালীঘাটে পাঁঠা বলি হয় জানিস নে? আমারও প্রায় তাই হবার যোগাড়। তোর কথায় ঘটকালি করতে গিয়ে দেবী মীণাক্ষির দরগায় বলি হয়ে যাই আর কি!' আমি বলি : 'অনেক কষ্টে মাথা বাঁচিয়ে বেরুতে পেরেছি।'

প্রিসিলা হাসতে থাকে।

সত্যিই, ঘটকালি আমার দ্বারা হবার নয়। সেটা আমি বেশ হাড়েহাড়েই টের পেয়েছি। শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন— শব্দের ঘটকতাই যার কাজ, সে যদি নিজের সীমা ছাড়িয়ে তার ওপরের পাড়তে বা তলার কুড়োতে যায়, জব্দ তাকে হতেই হবে। শব্দের ওপরে রয়েছে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি। সব-উপরের

অরূপের থেকে নেমে এসেছে থাকে থাকে। শব্দের ওপরে দাঁড়িয়ে থেকেও তারা ছাড়িয়ে গিয়েছে তাকে। আর তার তলায় অর্থের ছড়াছড়ি—শব্দকে জড়িয়ে থেকেও ছড়িয়ে গিয়েছে দিগ্বিদিকে। নিতান্ত শাব্দিক কি কদাপি তাদের নাগাল পায়? শব্দকে ছেড়ে অর্থের রাজযোটকে গেলেই তার অনর্থ বাধে; গন্ধ-স্পর্শের গণপণ মেলাতে গিয়ে মেলে না; রূপের সঙ্গে রূপের মিল ঘটাতে গিয়ে অপরূপ না হয়ে বিরূপ হয়ে ওঠে সবটাই। রসায়ন না হয়ে শেষ পর্যন্ত কষায়নে দাঁড়ায়।

'না। আর আমি কশাঘাত সইতে রাজী নই। খুব শিক্ষা হয়েছে আমার।' বলে অবশেষে আমি খসাই। '—তবে হ্যাঁ, একটা ঘটকালি করবো আর। আর একটাই। তোর ঘটকালিটা।'

'আমার?' প্রিসিলার ডাগর চোখ ডোগর হয়ে ওঠে।

'হ্যাঁ। তোর মা বলছিলো, রবির সঙ্গে তোর বিয়ে নাকি প্রায় ঠিকঠাক। মনে হচ্ছে, এই ঘটকালিটা আমার দ্বারা হবে। এইটাই আমি পারবো।'

'তা আর তোমায় পারতে হয় না।' প্রিসিলা পাড়ে—'রবি আর নেই।'

'নেই, তার মানে?' আমার চমক লাগে।

'রবি অস্ত গিয়েছে।'

'আজ সকালেও তাকে দেখেছি।' আমি জানাই: 'রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে দেখলাম। বেশ চাঙ্গাই তো দেখা গেল। অস্তমিত হবার কোনো লক্ষণ নেই।'

'মানে সে সুদূরপরাহত।' প্রিসিলা ভৈরবী ভাঁজে : 'আমার জীবনে আর সে উদিত হবে না।'

'সে কি রে! তা কি হতে পারে?' আমাকে হতবাক্ হতে হয়।—'রবি যে প্রিস্ বলতে উল্টে পড়তো?'

'আবার সে উল্টেছে। ডবল সামারসল্ট এবার।'

'অ্যাঁ?'

'আর সে এ-মুখো হবে না।'···প্রিসিলা জানায় : 'কিন্তু আমার কোনো দোষ নেই মেজমামা। দোষ ওরই। ও কেন আগে থেকে এন্‌গেজ না করে এল···?'

'এন্‌গেজ আবার কি করবে রে? তোরা তো এন্‌গেজড হয়েই আছিস···'

'আমি কি করে জানবো যে, ও অমন অসময়ে আসতে যাবে? যেমন না বলে কয়ে হুপ্ করে আসা···! কিন্তু তার কথা থাক মেজমামা।' প্রিসিলা অন্য কথা তোলে : 'জানো, আমাদের পাড়ায় নতুন এক পুলিশ অফিসার এসেছেন?'

'পুলিশ কেন আবার?' আমি বাধা দিই, 'এর মধ্যে আবার পুলিশ কেন?' কোনো কাজের মধ্যে, এমনকি, কথাতেও, পুলিশের যাতায়াত আমার ভালো লাগে না।

পুলিশ এলেই সবকিছু গুলিয়ে যায়। পুলিশ নিজেই গুলিয়ে দেয়, আর সর্বদাই যে পিস্তল দিয়ে, তা নয়। পুলিশের ভ্যাজাল আমি সবচেয়ে ভয় করি।

'কত ভালো ভালো ছেলে আজকাল পুলিশে ঢুকছে, তার তুমি খবর রাখো?' ও শোনায় : 'যেসব ছেলে ইচ্ছে করলেই

জজ, মাজিস্ট্রেট, উকীল কি ডাক্তার হতে পারতো, তারা তা না হয়ে—'

'দারোগা হয়ে যাচ্ছে এখন। কিন্তু সে-খবর জানতে আমার কোনো কৌতূহল হয় না।'

'আমাদের গলিতে যে নতুন সাবইন্সপেক্টার এসেছে, তাকে দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। বয়স বেশি নয়, চব্বিশ-পঁচিশ, কিন্তু কী মাসকুলার বডী! আর কেমন টল ফিগার! তাকে যদি তুমি দ্যাখো,···মোড়ের বাড়িটায় এসে উঠেছে।'

'এসেই বুঝি তোকে অ্যারেস্ট করেছে? মানে, তোর মনকে?' আমার আমেজ লাগে এবার: 'শুনি তো ব্যাপারটা—টল ফিগারে তোকে কতখানি টলালো শোনা যাক।'

'রোজ আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যায়। ঠিক বেলা ছুটোর সময়। আমি জানালা দিয়ে দেখতে পাই।' বলে সে একটু থামে, তার পরে কতদূর অবধি দেখেছে, তার একটা ফিরিস্তি দেয়—'লম্বা ছ' ফুট, স্লিম্, আর কী সুন্দর যে দেখতে! ম্যান্‌লি চেহারা যাকে বলে।'

'কথা কয়েছিস তার সঙ্গে?'

'কারো গায়ে পড়ে কথা কইবো তেমন মেয়ে আমি নই। অত সস্তা আমায় পাওনি। তবে হ্যাঁ, পুলিশের কথা আলাদা। বিপদে-আপদে পড়লে-পুলিশের সাহায্য তো নিতেই হয়, তাতে দ্বিধা করা উচিত নয়। কোনো মেয়ের পক্ষে অন্তত, কী বলো? পুলিশরা তো আমাদের উদ্ধার করার জন্তেই রয়েছে, তাই না?'

'কথাটা ঘুরিয়েও বলা যায়। তারা থেকেই আমাদের উদ্ধার করছে।'

'তাই কী করবো? বাধ্য হয়ে আমাকে বিপদে পড়তে হলো।...সেদিন কী একটা উৎসবে মা বেলুড় মঠে গিয়েছে, ফিরতে সেই সন্ধ্যে। বাড়িতে আমি একলা। ছুটো বাজতেই দেখা গেল তরুণ অফিসারটি গুটি গুটি চলেছেন গলি দিয়ে। আমি হাতের নভেলটা না ফেলেই লাফিয়ে উঠেছি তক্ষুণি...'

'কোন দিকে তোর নজর ছিলো এতক্ষণ? নভেলের পাতায়, গলির মোড়ে, না কি, ঘড়ির কাঁটার দিকে?'

'তিন দিকেই।'

তাক্ লাগলেও আমি অবাক হইনে। ভেল্কির মতো মনে হলেও এটা আর এমন কী নভেলটি? মেয়েরা একচোখো হতেও যেমন, তেমনি আবার তাদের তিনগুণ চোখা হতেও বাধা নেই। ভগবতী শুধু স্বর্গেই না, এই ধরাধামেও তাঁদের—ত্রিনয়নীদের দেখা যায়।

'যাক্, তার পর—সেই ত্র্যহস্পর্শের পরে?'

'মুখে না একপোঁচ পাউডার বুলিয়েই আমি তর্ তর্ করে নেমে গিয়েছি সিঁড়ি দিয়ে—এক ছুটে সেই রাস্তায়। বিপদে পড়লে যেমন করে দৌড়োয় মানুষ, ঠিক সেই রকম।'

আমি চুপ করে ওর দৌড় দেখি।

'ছুটতে ছুটতে গিয়ে ধরেছি ওকে। 'পুলিশ পুলিশ!' হাঁকতে হাঁকতেই। ও তখন গলির ও-মোড় অব্দি চলে গিয়েছে। রাস্তা নির্জন ছিলো তাই রক্ষে, নইলে এমন ভয় করছিলো আমার...'

'পাছে কেউ দেখে ফ্যালে তোর এই পাগলামো? এই উন্মত্ত অভিসার?'

'পাছে পুলিশের সাহায্য পাবার আগেই পাড়ার বকাটে ছোঁড়ারা সাহায্য করতে দৌড়ে আসে।...আমার হাঁকডাকে সে থমকে গিয়েছিলো...। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে বললাম—আমাকে বাঁচান মশাই! ভারী বিপদে পড়েছি। বাঁচান আমায়।'

'সাবইন্সপেক্টার শুধালো—'কী হয়েছে বলুন?'

'আমার ঘরে এক চোর ঢুকেছে। তার হাতে ইয়া প্রকাণ্ড এক সিঁধকাটি।' আমি বললাম।

'ও এই! আমি ভাবলাম কি জানি কী!' বলে সে হাসলো একটু।

'ডাকাতের মতো চেহারা লোকটার।' আমি বললাম, একটুও দ্বিধা না করে'। আমার কথায় জোর দেবার জন্যেই চোরের ওপর ডাকাতটাকে আমদানি করতে হলো।—'যেমন বিশ্রী তেমনি বদ্‌খৎ!'

'ভারী বদ্‌লোক তো!' সে বললে—'এই অসময়ে এক অসহায়া তরুণীর ঘরে...!'

'ভয়ঙ্কর লোক।' সায় দিলাম আমি।—'তা আর বলতে হয় না।'

'আপনার ঘরে ঢুকে করছিলো কী লোকটা? চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা, বাটপারি, রাহাজানি—নাকি, অন্য কোনো অপকর্মের চেষ্টায় ছিলো? না কি, এমনি অকারণে ঘুর ঘুর করছিলো কেবল?'

'আমাকে আসতে বাধা দিচ্ছিলো আপনার কাছে।'

'বটে ? এতদূর আস্পর্ধা ? আপনি কী করলেন তারপর ?'

'আমি একছুটে পালিয়ে এসেছি। তার হাত ছাড়িয়ে।'

'বেশ করেছেন। আচ্ছা, আমি তাহলে এখন আসি ? নমস্কার! বড্ডো দেরি হয়ে গিয়েছে। ঠিক সময় আবার থানায় হাজির না দিলেই নয়। নইলে ও-সি ভারী রাগ করেন।'

ওর কথায় আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম।—'সে কি! আমার ঘরে যে-চোরটা রয়েছে তাকে পাকড়াতে আপনি যাবেন না ?'

ও বললে—'এখন গিয়ে আর কী হবে ? সে কি আর এতক্ষণ রয়েছে ? নিতেও কিছু বাকি রাখেনি। মালপত্তোর যা নেবার নিয়ে সরে পড়েছে কোন কালে! আপনি এখন নিশ্চিন্ত মনে ঘরে যান।'

'কিছুতেই যাবো না।' আমি তখন বললাম—'লোকটা হয় তো দাগী বদমায়েস হবে। জেলপালানোও হতে পারে। আমাকে খুন করার জন্যেই এসেছে কিনা তাই বা কে জানে!'

'কিন্তু এখনো তো খুন করেনি। খুন না করলে আর আমরা কী করতে পারি বলুন ? আপনার খুন হবার পর তারপরে যা করবার সমস্তই আমরা করবো, সেজন্য আপনি ভাববেন না।'

'বারে! আমি মারা যাই, তারপরে আপনারা এসে আমার কী উদ্ধারটা করবেন শুনি ?' এমন আমার রাগ হয় ওর কথায়।

আমি হাঁ করে প্রিসিলার কাহিনী শুনছিলাম, এতক্ষণে আমার দন্তস্ফুট করি—'ঠিক কথাই বলেছে সে। খুনের কিনারে যাওয়া

নয়, খুনের কিনারা করাই ওদের কাজ। খুন হচ্ছে বিলাস— দুজনের পক্ষে। যে খুন করে আর যে পুলিশ। আর যে বেচারা মারা পড়ে সে হচ্ছে নিতান্তই লাস। কিন্তু কেউ মারা না গেলে তো পুলিশ তাকে নিয়ে বিলাসিতা করতে পারে না। একজন আগে তাকে স্বর্গে পাঠালেই তারপরে তারা এসে তাকে মর্গে পাঠাতে পারে।'

'মরুক্ গে। মর্গে আমি গেলে তো? তখন আমি এস-আইকে বললাম, 'না মশাই, আপনাকে আমি কিছুতেই থানায় যেতে দেবো না। একলা আমাকে একটা গুণ্ডার মুখে ফেলে এক পাও নড়তে দিচ্ছিনে আপনাকে।'

আমার কথায় সে যেন একটু ভড়কালো—'দেখুন, রাস্তার মাঝখানে এ-সব কী হচ্ছে?' বললো সে আম্‌তা আম্‌তা করে'।— 'জানেন, পুলিশের কাজে বাধা দিলে কী হয়? সেটা একটা গুরুতর অপরাধ। তার জন্য এখুনি আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করতে পারি, তা জানেন?'

'করুন গ্রেপ্তার। তাবলে' আমি আপনার কথায় একজন বাজে গুণ্ডার হাতে আমার প্রাণ খোয়াতে পারিনে। কিছুতেই না। তা, সেটা হাজার আইনসঙ্গত হলেও।' বলে আমিও বেঁকে দাঁড়ালাম।

'শান্তিভঙ্গের দায়ে আপনাকে ধরে থানায় নিয়ে যেতে পারতাম, তাই নিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু তার চেয়ে চলুন আপনার বাড়িতেই যাওয়া যাক্।' বললো সে শেষমেষ।

দরজার সম্মুখে এসে সে একটু থমকে দাঁড়ালো—'আপনি

আগে যান। কোনো ভয় নেই, আমি আপনার পেছনেই আছি।'

সিঁড়ির কাছে আসতেই আবার তার ভাবান্তর দেখা গেল।

'আপনি আগে উঠুন।' একটু ইতস্ততঃ করে সে বললো— 'পুলিশকে দেখলে গুণ্ডারা ভারী ক্ষেপে যায় কি না! আমাকে দেখতে পেলে রাগের মাথায় যা তা কিছু একটা করে বসতে পারে।'

কিন্তু কথাটা আমার ভালো লাগলো না। একটা মেয়েকে অকাতরে খুনখারাপির দিকে এগিয়ে দিয়ে তার আড়াল ধরে যাওয়া—ব্যাপারটা ঠিক যেন বীরোচিত বলে মনে হলো না।

সে না হয় বললো কিন্তু তাবলে আমিই বা কি করে এগুই? যদিও জানি যে, আমাদের ফ্ল্যাটে জনমনিষ্যিও নেই, তাহলেও গুণ্ডারা ভারী মারাত্মক হয়ে থাকে, তাদের কাছে ছোরাছুরি থাকেই।

'বোমাও থাকে আবার।' আমি তার কথায় যোগ দিই: 'সেগুলো নিয়েও তারা ছোড়াছুড়ি করে।'

'করেই তো!' প্রিসিলা সায় দিলো আমার কথায়:

'কিন্তু কী করবো? ছোরার সামনে অকুতোভয়ে এগুতেই হলো আমাকে।'

'তুই বীরাঙ্গনা। সামনে ছোরা, পিছনে আরেকটা—' আমি বললাম: 'তবে পেছনেরটা ভোঁতা, এই যা।'

'আমি পা টিপে টিপে উঠলাম সিঁড়ি দিয়ে— এস-আইকে পেছনে নিয়ে। নিজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

'এবার—এবার আপনি এগোন'। আমি তাকে বলি—'গলার আওয়াজ যতদূর পারি খাটো করে'।

'দাঁড়ান। কাউকেই এগুতে হবে না। এখানে দাঁড়িয়েই হবে।' বলে সে নিজের কোমরে বাঁধা পিস্তলের খাপের ওপর হাত রাখলো।—'দরজার সামনে দাঁড়ানোটা ঠিক নয়। স্টেনগান ব্রেনগান পিস্তল টিস্তল থাকে ব্যাটাদের কাছে। গুলী টুলি ছোড়ে যদি ? দরজাটা ছেড়ে পাশের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো যাক--আপনি ওধারটায়, আমি এধারে।' ফিস্ ফিস্ করে সে বলে।

তারপরে সে নিজের হাঁক ছাড়ে—'এই! কে আছো ভেতরে ? ভালোছেলের মতো বেরিয়ে এসো—কোনো গোলমাল না করে'। আমরা পুলিশের লোক চারধার ঘিরে ফেলেছি। পালাবার কোনো পথ নেই। তোমাকে ঘেরাও করে ফেলা হয়েছে।'

তারপরে যা ঘটলো মেজমামা, আমি প্রায় মূর্ছা যাই আর কি! ভাগ্যিস দেয়ালে হেলান দিয়ে ছিলাম—তাই রক্ষে!

ঘরের ভেতরে ··ঘরের ভেতর থেকে কার যেন গলা পাওয়া গেল। ঘড় ঘড়-করা গলা।

'ভূত নাকি ?' আমি আঁৎকে উঠি। 'দিন দুপুরে ভূত ? বলিস কি তুই ?'

'না, ভূত নয়, ভূত হলে তো বাঁচতাম।' জবাব দেয় প্রিসিলা—'তার চেয়েও ভয়াবহ।'

'ঘর্ঘর-ধ্বনিটা কী করলো তারপর ?'

'বেরিয়ে এল ঘরের ভেতর থেকে। জুলুর জন্মদিনে উপহার দেবো বলে যে টয়-পেস্তলটা কিনেছিলাম, আমার টয়লেটের টেবিলে

ছিলো, সেইটে হাতে করে সে বেরুলো।—'পুলিশই হও আর যেই হও বাবা, হুঁশিয়ার! সামনে পেলেই আমি গুলী করবো। গুড়ুম-গুড়ুম—গুম্!'

বলতে বলতে সে বেরুলো।

আর কেউ নয়, আমাদের রবি!...

'রবি!' পিস্তলের গুলীটা যেন আমার বুকেই এসে লাগে। আক্কেল গুড়ুম করে দেয়।—'বলিস কি রে প্রিস্? কী করছিলো সে ওখানে?'

'ওই জানে! হয় তো স্নো ঘষছিলো মুখে। কিন্তু সে যে এমন অসময়ে এসে হানা দেবে তা আমার ধারণাও ছিলো না। স্বপ্নেও আমি ভাবিনি।'

'হানাদারদের কথা কি কিছু বলা যায়? কখন আসে কখন যায়, কিছুই তার ঠিক ঠিকানা নেই।' আমি বলি—'যাকগে, তারপর?'

'যেমনি না সে বেরিয়েছে অমনি না এস-আই অতর্কিতে লাফিয়ে পড়েছে তার ওপরে। তাকে ধরে পাছড়ে ফেলে তার বুকের ওপর বসে হাত দুটো জাপটে ধরেছে। রবিকে কাবু করে এস আই আমার দিকে তাকালো—'একটু দড়ি। দড়িদড়া কিছু থাকে তো দিন তো আমায়। আমার সঙ্গে এখন হাতকড়া নেই কিনা।'

দড়ি ছিলো না। আমার খানকয় রুমালে গিঁট মেরে দড়ির মতন করে দিলাম। রবির হাত দুটো সে শক্ত করে বাঁধলো।

তারপর সে উঠলো। রবিও উঠলো আস্তে আস্তে। জোড় হাতের পর ভর দিয়ে উঠলো কোনোরকমে।

উঠেই সে সম্বোধন করলো আমায়—'এ কি প্রিস্? এসব কী? এ কিরকমের ঠাট্টা? আমি তোমায় তিনটের শোয়ে সিনেমায় নিয়ে যাবো বলে এলাম, আর তুমি কিনা—ও লোকটা কে?'

'কে তা কি দেখে টের পাচ্ছো না জাদু? অপরের বাড়িতে—এইভাবে অনধিকার প্রবেশ, পুলিশকে অযথা ভীতি-প্রদর্শন ইত্যাদির দারুণ অভিযোগে তোমাকে আমি এক্ষুণি গ্রেপ্তার করলাম। এখন থানায় চলো তো বাছাধন!'

'কী মুস্কিল! কোথায় সিনেমায় ছবি দেখতে যাবো, না কোথায়—প্রিস্, বলে দাও না পুলিশটাকে, আমি কে। ভালো করে বুঝিয়ে দাও না লক্ষ্মীটি!'

'আপনি কি এই আসামীকে চেনেন নাকি?' শুধালো এস-আই।

'কক্ষনো না।' বললাম আমি তক্ষুণি—'কোনো জন্মে ওকে আমি দেখিনি।'

'অ্যাঁ?' শুনে তো রবির চোয়াল ঝুলে পড়লো—'কী বলছো তুমি প্রিস্? তুমি না আমার বাগ্‌দত্তা—মানে, তোমার সঙ্গে কি আমার বিয়ের ঠিক হয়নি?'

'কস্মিন কালেও না। চিনিই না আমি তোমায়।'

'বেশ। তাহলে এই আমি ধর্মঘট করলাম। যাকে বলে সিট্‌ডাউন স্ট্রাইক।' বলেই হাতজোড়া অবস্থাতেই সে শুয়ে পড়লো ভুঁয়ে—সটান—একটু আগেই যেখানে সে ধরাশায়ী ছিলো।—'দেখি কে আমায় কেমন করে নিয়ে যায় থানায়? আমি প্রায়োপবেশন করছি।'

'এই সেরেছে! প্রায়োপবেশন?' শুনেই এস-আই যেন আঁৎকে উঠলো। তাকে বেশ ঘাবড়াতে দেখলাম। 'না বাবা, আমি এসবের মধ্যে নেই।' গজ গজ করতে লাগলো সে—'একদম না। প্রায়োপবেশন মানেই একটা খবর। খবরের সঙ্গে জড়ানো খবরের কাগজ। আন্দোলন। ময়দানের মিটিং। আর সেই সঙ্গে যত সাংবাদিক। না বাবা, যাতে সাংবাদিকরা আছে তার ত্রিসীমাতেও আমরা নেই। আর না।'

'বলিস কিরে? তাই বললো নাকি সেই পুলিশটা?' আমি অবাক হই। যাদের নাকি ভয়ডর নেই, সবাই যাদের ডরায়, তারাও আবার ভড়কায় নাকি? যারা আমাদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক সেই পুলিশকেও ভয় খাওয়াতে পারে এমন দোর্দণ্ড কেউ আছে নাকি এই দুনিয়ায়!

'তোমাদের দুজনকেই কালপ্রিট বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে।' সাবইন্সপেক্টারটা বললো তারপর—'আমাকে প্যাঁচে ফেলবার তালে আছো তোমরা। তোমাদের নামে পুলিশে গিয়ে আমি রিপোর্ট করছি। কিন্তু করেই বা কী হবে, ও-সি. এ-সি. কেউই এ ব্যাপারে মাথা গলাবে বলে মনে হয় না। মাঝখানে সাংবাদিক রয়েছে যে! সাংবাদিক মানেই হট্টগোল। জনসমাবেশ। সেখান থেকে সেই ছেঁড়া গণ্ডগোল গড়িয়ে বিধানসভায়, লোকসভায়। ডিপার্টমেণ্টাল এনকোয়ারি। তদন্ত কমিশন। সাস্পেন্সন্, ট্রান্সফার, যাচ্ছে-তাই। প্রোমোশন বন্ধ, নানান ফ্যাচাং। না বাবা, ওসবের মধ্যে আমি নেই। আমরা নেই। আমি চললাম।'

'এস-আই চলে গেলে রবি তার অবস্থান-ধর্মঘট ভাঙলো।

মাটি ছেড়ে উঠলো আস্তে আস্তে। জোড় হাতে গায়ের ধুলো ঝাড়ার একটুখানি বৃথা চেষ্টা করে তারপরে ধীরে ধীরে নেমে গেল সিঁড়ি ধরে। একটিও কথা না বলে'। আমার দিকে একবারটিও না তাকিয়ে। আমার রুমালগুলোও সে নিয়ে গেল। নিজের হাতে করেই···।'

'মনে হচ্ছে, ওগুলো সে আর ফিরিয়ে দিতে আসবে না।' আমার সন্দেহ প্রকাশ করি।—'তুই ওকে যা দুরস্ত করেছিস! প্রায় দিল্লীর মতোই সে দূর্‌অস্‌ত্‌ হয়ে গিয়েছে!'

আর সে সহজে প্রিসির নিকটস্থ হবে না মনে করে আমার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

শালুমাসীর রাঁধুনী

শালুমাসির জন্যে রাঁধুনী খোঁজার বরাত ছিলো, কিন্তু বরাতে ছিলো না। আমার সাত মাসি (শালুমাসি বাদে) আর শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে তাঁর সত্তর জনা বোনপো-বোনঝি ঘুরে ঘুরে হয়রান হলাম, কিন্তু সারা কলকাতা সহর আতি পাঁতি করেও একটা রাঁধুনীর পাত্তা মিললো না।

কিন্তু রাঁধুনীর হাতের রান্না খাওয়ার লোভ সামলাতে পারলেও, শালুমাসি বিয়ের পর নিজের ঘরকন্না কেমন গুছিয়েছেন, তা না দেখে বসে থাকা একটু শক্ত বইকি। তাই একদিন 'দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাতে' শালুমাসির কক্ষের দুয়ারে গিয়ে উঁকি মারলাম। একটু ভয়ে ভয়েই।

'আরে আয় আয়! অ্যাদ্দিন আসিসনি কেন?' আমাকে দেখেই উছলে উঠলেন শালুমাসি।

ভয়টা কাটলো। সাহসভরে এগুলাম—'মাসিমা, তোমার রাঁধুনী তো···' অধোবদনে বলতে যাই।

'সে আর বলতে হবে না, বোঝা গিয়েছে। আরে, রাঁধুনী আনা কি তোদের কম্মো রে? তুই আর ডালু আমার রাঁধুনী খুঁজে দিবি আর তার হাতের রান্না আমি খাবো, তবেই হয়েছে! তোদের রাঁধুনী এসে আমায় রেঁধে খাওয়াবে, সেই ভরসায় থাকলে

রান্নাঘরে লালবাতি জ্বেলে ভাতের হাঁড়ি কবে শিকেয় তুলে রাখতাম। হ্যাঁ, তোদের মুখ চেয়েই আমি বসে আছি কি না!'

'শালুমাসি, চেষ্টার আমি কোনো ত্রুটি করিনি—যদ্দূর খুঁজবার আমরা প্রাণপণ—'

'হয়েছে হয়েছে!' শালুমাসি আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কথার মুখে একটা থাবড়া মারেন—'আর আমায় বলতে হবে না। তোদের ভরসায় ছিলাম কি না! রাঁধুনী কি করে পেতে হয় আমি জানি। তার হাড়হদ্দ জানা আছে আমার। সারা কলকাতা চুঁড়ে তোরা পেলিনে, আর কোথাও না ঢুঁ মেরে এই ঘরে বসেই আমি পেয়েছি। অবাক হয়ে চাইছিস কি? রাঁধুনী আমার আঁচলের গেরোয়।'

'পেয়েছো? পেয়ে গিয়েছো রাঁধুনী?' শুনে আমি আকাশ থেকে পড়ি। পড়ে হাঁফ ছাড়ি।

'পাবো না? পেতে জানা চাই। আর পেয়েছি বলে'! যা-তা হেঁজি-পেঁজি রাঁধুনী নয়—রীতিমতো লিখিয়ে পড়িয়ে যাকে বলে আর্টিস্ট রাঁধুনী। রান্নার আর্ট তার আঙুলের ডগায়। হেন রান্না নেই, যা সে জানে না। রান্নার রাজ্যে এমন কোনো এলাকা নেই, যা তার অজানা। দিশি, বিদেশি, মোগলাই, পাটনাই—সব রকমের খানা বানাতে ওস্তাদ—এমনকি, তোর ঐ চীনে রান্নাও। এরকম একটি রাঁধুনী কলকাতায় আর কারু বাড়ি পাবিনে।'

'আস্তো এক রন্ধন-সম্রাজ্ঞী বলো।' আমি বলি: 'কি করে এটিকে পাকড়ালে শুনি তো? পাকঘরের এই পাকেশ্বরীকে?'

'বুদ্ধি লাগে। এই বাজারে একটা রাঁধুনী পাওয়া—রাঁধুনী

রাখা চাট্টিখানি নয়। অমনি হয় না। অনেক মাথা খাটিয়ে পেতে হয়েছে। নইলে কি মেলে রে? বুদ্ধি চাই। সহজে কি আসে ওরা? রাঁধুনীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে জানা চাই। নইলে কি ওরা থাকে? সেই কৌশলটি জানে ক'জনা?'

এমনভাবে বললেন শালুমাসিমা, মনে হলো, ভালো রান্নার মতোই রাঁধুনীটিকে (কিংবা নিজেকেই) তারিয়ে তারিয়ে তিনি চাখছেন।

'তা বটে! তা বটে!!' আমিও তারিফ করলাম।

'শোন কি করে পেলুম বলি—' শুরু করলেন শালুমাসি: 'খবর কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে পেলাম। পাত্রপাত্রী সংবাদের বিজ্ঞাপন দেয় না? সেইরকম কাগজের ব্যক্তিগত স্তম্ভে বিবৃতি দিয়ে জানালুম যে, আমার একটি সর্ব-রান্নায় সুদীক্ষিতা শিক্ষিতা রাঁধুনী চাই—বেতন মাসিক এক শ' টাকা।'

'অ্যা-ক-শ' টাকা?'

আমার চোখ আর কপালে একশা হয়।—'রাঁধুনীর বেতন এক শ'!'

'এক শ' টাকা এমন কি বেশি হলো শুনি? আজকের দিনে ওর কমে কি ঝি-চাকর মেলে যে, রাঁধুনী মিলবে? উনি যদি শুধু ঘুষি মেরে এক রাত্তিরে হাজার টাকা কামান—খালি হাতেই?' বলে মাসিমা আমার কুস্তিগীর শালু-মেসোর প্রতি এক কটাক্ষ করলেন—তাঁর অনুপস্থিতিতেই! যেন খালি হাতে কামানো এতই কঠিন? কিম্বা এতই সোজা? যেন আর কেউ তা কামায় না! পকেট-কাটাদের যেন খালি হাত ছাড়াও আরো কিছু সম্বল থাকে!

'ঘুষ মেরেও তো লোকে কত হাজার হাজার কামায়,' আমি আরেক দৃষ্টান্ত আনি—'তাই বলে রান্না তো আর ঘুষোঘুষি নয় ?'

'তোর যেমন কথা! সামান্য ঐ এক শ' টাকতেই কি রাঁধুনী আসে রে ? তার সঙ্গে আরো আছে, তার থাকার জন্যে আলাদা ঘর, আধুনিক কেতায় সাজানো ; সঙ্গে-লাগাও বাথরুম, রেডিও, ড্রেসিং-টেবিল, আলমারি, দেরাজ, আলনা—এসব দেবারও কড়ার ছিলো আমার। তাতেই বা আর কী এমন রেস্পন্স পেয়েছি বল্? খান কয়েক তো জবাব এল মোটে! তার ভেতর থেকেই বেছে একজনকে লিখলাম—সানুনয় অনুরোধ জানিয়ে—যদি তিনি দয়া করে তাঁর অবকাশ মতন একদিন এধারে বেড়াতে বেড়াতে আসেন। চিঠির সঙ্গে টাকা দশেকের একটা চেক দিয়ে—ট্যাক্সি ভাড়ার বাবদে—আর আসতে আসতে মাঝপথে যদি তাঁর কোনো সিনেমা-ছবি দেখার খেয়াল হয়, সেজন্যেও বটে!'

'শালুমাসি, তুমি অতুলনীয়া।' মনেতে হয় আমায়—'মেয়ে-ভোলানোর—ভুলিয়ে ভালিয়ে আনার এমন কায়দা কোনো ছেলেরও জানা নেই। কুন্‌কী হাতীরাও জানে কিনা সন্দেহ!'

'তারপর এল সে। আসা মাত্রই তাকে গরম গরম খান দুই টোস্ট, একজোড়া ডিমের অমলেট আর চা বানিয়ে দিয়েছি—তারপর চা-টা খেয়ে মেয়েটি যেন মেজাজে এল। আপাদমস্তক আমার সে তাকিয়ে দেখলো একবার। দেখে শুনে আমাকে তার পছন্দ হয়েছে বলে মনে হলো।'

'হলো পছন্দ ?'

'চেহারাটা এমন কিছু খারাপ নয়—না-না, আমার কথা

বলছিনে, সেই মেয়েটির। তবে একেবারে একেলে তরুণীও না, আবার নেহাৎ সেকেলেও নয়—মাঝামাঝি গোছের আধাবয়সী এক মহিলা। তা হোক। তবু যে ধরাকে-সরা-জ্ঞান-করে নাক উঁচু-করা মেজাজ নিয়ে আসেনি সেই রক্ষে! আমার সাতপুরুষের ভাগ্যি।'

আমি হাঁ করে তাঁর কথা শুনি—আমার সাত মাসির মধ্যে সবচেয়ে মহীয়সী পটিয়সী শালুমাসি!

'তারপর, চা খেতে খেতেই কাজের কথা পাড়া গেল। আমি বললাম, 'দেখছো তো বাছা, রান্নবান্না যে একেবারে জানিনে তা নয়। এক-আধটু—এক আধটা পারি। অমলেটটা কি নেহাৎ খারাপ বানিয়েছি? চা মুখে তোলা যাচ্ছে তো? কী বলো? চলনসই গোছের রান্না আমার জানা আছে—আমার কর্তাও তাই খেয়েই খুশি। রাঁধাবাড়ার অনেকখানি আমিই করবো—তোমাকে খুব বেশি কিছু করতে হবে না। তবে কি না, তুমিও থাকলে। যখন তোমার মর্জি হলো, সুবিধে পেলে, একটু নিজের হাত লাগালে নাহয়।'

'বুঝেছি।' বললে রাঁধুনী।

'ভোরের সেই কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই যে তোমাকে উঠতে হবে, তা আমি বলিনে' ভরসা দিলাম আমি তাকে : 'কর্তার বেড্-টি আমিই বানাই। বলো তো, সেই সময় তোমাকেও নয় এক কাপ দিয়ে আসবো। তবে ধরো, এই প্রায় ন'টা নাগাদ—যদি তোমার গা না ম্যাজ ম্যাজ করে—তখন যদি বিছানা ছেড়ে ওঠো, তাহলেই হবে। উঠেই যে তোমাকে কোনো কাজ করতে হবে তা নয়।

তোমার টেবিলে খবরের কাগজ থাকবে, বসে বসে পড়ো খানিক। বাংলা, ইংরেজি কোন কাগজ তোমার পছন্দ জানিয়ো। আমরা আনন্দবাজার নিই। তবে তোমার যদি কোনো বিশেষ পার্টির প্রতি ঝোঁক থাকে—তোমার জন্যে সেই পার্টি-পেপারই আনানো হবে। না, ইনকিলাবী কাগজ হলেও আপত্তি নেই। লোকসেবক, জনসেবক, স্বাধীনতা। যেটা চাও, অকপটে বলো। কোনো সঙ্কোচ করো না।'

'বলবো।' বললো সে।

'এটা হলো সাধারণ ছ' দিনের নিয়ম। রোববার দিন অবশ্যি আলাদা। সেদিন মোটেই কোনো তাড়া নেই। সেদিন তুমি আরো একটু গড়িয়ে—গড়িমসি করে দশটা এগারোটা নাগাদ উঠলেও পারবে। কুটনোকাটনা, আনাজপাতির কাজ, মশলাবাঁটা—এসব ঝিয়েই করে রাখে। না, দিনরাতের ঝি নয়—সে আর পাচ্ছি কোথায়? একটা ঠিকে ঝি আছে, সাত বাড়ির কাজ সেরে দয়া করে এক সময়ে পায়ের ধুলো দেন—কাজটাজ যা করার চুকিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যান। তারপরে ডিশ প্লেট্-এটাওটা ধোয়া মোছার যা কাজ থাকে সে সব আমিই করি—কর্তাও অবশ্যি এক-এক সময়ে হাত লাগান—লাগান না যে তা বলিনে। আর, কেমন করে ডিশ্‌কাপ্ না ভেঙে সাফ করা যায়, তার কৌশলও কিছু কিঞ্চিৎ শিখেছেন তিনি এর মধ্যেই—আমিই হাতে ধরে শিখিয়েছি। যাক, সেকথায় এখন কাজ নেই। আসল কথা হচ্ছে ধোয়ামোছার কোনো কাজে তোমায় বাছা হাত লাগাতে হবে না।'

'জেনে খুশি হলুম।'

'অবশ্যি, যে-যেদিন কর্তার বন্ধুবান্ধবরা আসেন সেদিনে একটু রান্নাবান্নার কাজ বাড়ে বইকি! দু'-একটা ফরমাসী জিনিস রাঁধতে হয়। এই ধরো, মোগলাই ধরনের কিছু। মাংসের পোলাও—শিক্‌কাবাব্‌ কি মোরগ মোসল্লাম—এইসব! এসব নিশ্চয় তোমার জানা আছে?'

'ও কিছু না।' অবহেলার হাসিতে সে উড়িয়ে দেয়।

'তবে সে খুব কদাচ। কালো বাজারে ভালো চাল পাওয়া তো সোজা নয় আজকাল। আর, প্রচুর পরিমাণে তো নয়ই। আর, আমার কর্তার বন্ধুরা—আর কর্তাটিও, বলতে নেই—বেশ একটু খাইয়ে।'

'সে তো সুখের কথাই।'

'সুখের তো বটেই! ভালোমন্দ খেতে খাওয়াতে যে সুখ, তার কি জোড়া আছে? আর সত্যি বলতে, তোমার মতন এমন পারদর্শী রাঁধুনী রাখা—সেইজন্যেই তো! তাহলে আমাদের রান্নাঘরটা দেখবে এসো।' বলে আমি তাকে রান্নাঘর দেখাতে নিয়ে গেলুম—'এই আমাদের রান্নাঘর। খাবার ঘর একেবারে ঠিক এর গায়েই। পরিবেশন করতে হাঁটাহাঁটির কিছু ধকল হবে না। আর, রান্না ঘরটাও আমাদের আধুনিক কায়দার। সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। গ্যাস-উনুনের রান্না। কয়লার উনুন নয়। ধোঁয়াটোয়ার বালাই নেই কোনো। আর প্যান ট্যান তো দেখতেই পাচ্ছো, সমস্ত দেয়ালের গায়ে লটকানো। মশলাপাতি ঘি-টি এই দেরাজের মধ্যে। হাতের কাছেই সব।'

'বেশ।'

'তোমার পছন্দ হয়েছে জেনে খুশি হলাম। তবে এই রান্নাঘরেই যে তোমায় সারাক্ষণ আটকা পড়ে থাকতে হবে তা নয়। মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে নিজের ঘরে গেলে—একটু পাউডার মেখে এলে—কি রেডিয়োর আধুনিক গান শুনে এলে একখানা—এই যে, এই এ-পাশেই তোমার থাকার ঘর। এমন কিছু বড় নয় যদিও, তাহলেও এটা নিয়ে, সব মিলিয়ে তোমার মোট আড়াইখানা ঘরই। আশা করি এতেই তোমার কুলিয়ে যাবে। এই ছোটখানা তোমার বসার ঘর। তোমার বন্ধু-টন্ধু কেউ এল···বসে গল্প করলে খানিক···আর এইটে শোবার···খাটমশারি সব খাটানো—দেরাজ আলমারিও আছে। এই তোমার সাজগোজের জায়গা—আয়না টেবিল এসব তোমার মনোমতো হয়েছে তো ? আর, এই হলো গে রেডিয়ো অলওয়েভ সেট—লেটেস্ট মডেলের। আর এধারে এই বাথরুম। তোমার এই ঘর তিনটি একেবারে একানে—এর মাঝখানের দরজা বন্ধ করে দিলেই একদম্ আলাদা। বাইরে যাবার আসার সিঁড়ি টিঁড়ি সব পৃথক। এই নাও, তোমার দিকের সদর দরজার চাবি। জানালার এই পর্দাগুলো বুঝি তোমার পছন্দ হচ্ছে না ? বেশ তো, যেমনটি তুমি চাও—যে-শেডের—সেইরকমই বদলে দেয়া যাবে। আর কি ?'

'খালি একটা জিনিসে আমার মন একটু খুঁৎখুঁৎ করছে।' সে বললে।

'কি বলো ?'

'ঘরটা আমার রান্নাঘরের এত কাছে যে···রান্নার ঝাঁঝ গন্ধ

সবই তো আসবে।...আর তাতে আমার প্রেরণা ব্যাহত হবে।'

'কী বললে মেয়েটা ?' মাসিমার কথায় আমি চমকে উঠি।—'প্রেরণা ব্যা—?' ওর বেশি আর এগুতে পারি না। কালীঘাটের মতন ব্যা বলেই হত হই।

'তাই তো বললে সে! শুনে তো বাপু আমি হতবাক! এমন কথা কোনো রাঁধুনীর মুখে আমার সাত জন্মেও শুনিনি কখনো।' জানালেন শালুমাসি '—কিসের প্রেরণা বাছা ?' তাকে আমি শুধোলাম।

'আমি একটা বই লিখছি কিনা ?'

'বই। সে আবার কি!' আরো আমায় অবাক করে দেয় সে।

'হ্যাঁ। আমার আত্মজীবনী। 'উনুনের ধারে বিশ বছর।' আর আপনিই বলুন না, রান্নাঘরের কয়লার ধোঁয়াই না হয় নেই, কিন্তু লঙ্কার ঝাঁঝ, সম্বরার গন্ধ এ সব তো রয়েছেই, তার মধ্যে বসে কি কখনো লেখা যায় ?'

'অন্ততঃ, আমি তো পারি না শালুমাসি।' তার কথায় সায় দিতে হয় আমায়।—'ঝাঁঝালো রান্না আর সম্বরার গন্ধে আত্মসম্বরণ করতে পারে এমন লেখক বাংলা দেশে বিরল।'

'বিশ বছর উনুনের ধারে ? বলো কি গো ?' শালুমাসির বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় : 'অ্যাদ্দিন ধরে তুমি রান্নার কাজে রয়েছো ? তোমার চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে এতখানি যে তোমার বয়েস হয়েছে তা তো বোঝা যায় না।'

'বিশ বছর নয় অবশ্যি।' জবাব দিলো রাঁধুনী : 'আর উনুনের

ধারেও যে তাও ঠিক নয়। তবে বই-এর নাম হিসেবে এটা বেশ ভালো শোনাবে বলেই দেয়া।'

'নির্ঘাত এটা একটা উঁচু দরের বই হবে।' শালুমাসি বলেন: 'বিক্রিও হবে খুব। তা, বাছা, তোমার কোনো ভাবনা নেই। লেখবার সময় তুমি বরং এই মাঝখানের দরজাটা একটু ভেজিয়ে দিয়ো। টেবিল আছে, চেয়ার আছে—আরামে লেখো না বসে বসে। কে বাধা দিচ্ছে? সে-বিষয়ে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। যাতে তোমার প্রেরণার ব্যাঘাত না হয়, তোমার সৃষ্টিকার্যে কেউ বাগড়া না দেয় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য থাকবে। কর্তা আর আমি টুঁ শব্দটিও করবো না। ঠিকে ঝিকেও মুখ নাড়তে বারণ করে দেবো। কিচ্ছুটি তুমি ভেবো না।'

'তারপর?' শুধালাম আমি শালুমাসিকে। 'কী হলো তারপর?'

'এইসব বোঝাপড়া হবার পর সে এল। তার পরদিনই তার খাতাপত্তোর নিয়ে এসে গেল। তবে হ্যাঁ, বলতে হয় বই কি! রান্নার আর্ট কাকে বলে জানে বটে মেয়েটা! তার ছু' ইঞ্চি রান্নার দাম হয় না।' শালুমাসি সগর্বে আমায় জানান।

'ছু' ইঞ্চি রান্না? সে আবার কি মাসিমা?'

রান্নার ব্যাপারে আমার এত দিনের ধারণা যেন টলে যায়। গজ ফিতে দিয়ে মাপতে পারি রান্নার এত বড় দিগগজ আমি নই। তা জানি। আর তেমন রান্না আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির বাইরে। রান্না বলতে আমি তো বুঝি ভাতের স্তূপাকার, চচ্চড়ির গাদা, আলুর গোলাকার (ওরফে আলুভাতের,) ডালের জলাশয়, নুনের

ছিটে ফোঁটা আর মাছ নামমাত্তোর। নেবুও যৎকিঞ্চিৎ। এর মধ্যে ইঞ্চির মাপে তো কেউ আসে না।

'ও হ্যাঁ, বুঝেছি। তুমি কাঁচকলা-রান্নার কথা বলছো?'

আমার মনে পড়ে যায়। একবার আমার আমাশা হলে বাসার ঠাকুর কাঁচকলার যে-ঝোল রেঁধেছিলো, তাতে ভাসমান সেগুলি ইঞ্চি-মাফিকই বটে। বেশ কয়েক ইঞ্চি করেই সেই কাঁচকলাগুলো।

'কিন্তু কলা থাকলেও, তোমার কথায় তাকে আমি রন্ধন-কলা বলতে পারবো না। সে-রান্না মুখে তোলা যায় না। আসলে তা হচ্ছে রান্নার কাঁচকলা।' আমি নিবেদন করি।

'আরে, আমি কি সেই কথা বলছি? তার দু'-ইঞ্চি রান্নার দাম দেয় কে? 'নয়া নয়া রান্না' বলে কোন কাগজে নাকি সে লেখা দেয়—একেবারে ইঞ্চি মেপে। দু' ইঞ্চি লেখার দাম দশ টাকা—চার ইঞ্চির কুড়ি টাকা, বুঝলি মুখ্যু? তোর মতো সাত পাতা লিখে পাঁচ টাকার কারবার নয় ওর।'

'ও, তাই বলো! বিজ্ঞাপনের দাম পায় লেখায়। বুঝেছি। বিজ্ঞাপনের দরে লেখা দিয়ে থাকে।' মেয়েটির লেখা যে খুব কদরের তা আমি বুঝতে পারি। আমার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

'এতো রকমের রান্না জানে মেয়েটা। মোগলাই, পাটনাই, গুজরাটি, মাদ্রাজী—এমন কি, বাঙালে রান্নাও। তারপরে এটার সঙ্গে ওটা মিলিয়ে, সেটা মিশিয়ে, মাত্রা কমবেশি করে' আনাজ পেঁয়াজের অদলবদলে—এমনি নানান তারতম্যে—যাকে বলে বিভিন্ন ধরনের রান্নার পারমুটেশন্ কম্বিনেশন—তাই করে আরো কত

রকমের সোয়াদ যে আনে! কত হাজার রকমের রান্না যে ও বানাতে পারে তা বলা যায় না। জানিস, খালি এক সর্ষে-ইলিশই সাত রকমের রাঁধতে জানে!'

'বলো কি মাসিমা!' শুনে আমি মূর্ছিত হবার মতোই। সঙ্গে ইলিশ না থাকলে সেই ধাক্কাতেই হয়তো আমায় সর্ষে দেখতে হতো।

'হ্যাঁরে, যেমন রামধনুর সাতটা রঙ—রঙ হয়েও একটার থেকে আর একটার তফাৎ—তেমনি একই সর্ষে দিয়ে রাঁধা হলেও সাত রকমের ইলিশের সাত রকমের সোয়াদ—একটুখানি শেডের ইদিক-উদিক। সে তুই কখনো খাসনি! সুরের যেমন আছে না? সা রে গা মা পা ধা নি—ইলিশ মাছেরও সেটা তেমনি এক সারেগামা। রান্নার মহাসঙ্গীত—জিভের কান দিয়ে শুনবার।'

'ক্যাপিটাল!' শুনতে শুনতে আমি সজিভ হই: 'আহা! সর্ষে ইলিশের সেই সা রে গা মা পা ধা নি! রান্নার রাজধানী বলো মাসিমা!' সুরের ব্যঞ্জনার মতো ব্যঞ্জনের সুর আমার মধ্যে ওতপ্রোত হতে থাকে।

বাঃ, বেশ আছে মাসিমারা। এক দিকে রান্নার এই মহাসঙ্গীত, আরেক দিকে এই মহাসঙ্গত। একধারে উচ্চাঙ্গ রান্নার এই খেয়াল—নানান পদের ধ্রুপদ—অন্যদিকে টপ্‌পা! টপ্‌পাটা মাসিমাদের দিকেই—টপাটপ্‌ গেলবার।

'দেখবি নাকি রাঁধুনীটিকে? তাহলে আয়, পা টিপে টিপে আয়, খবরদার, একটুও যেন শব্দ না হয়, আওয়াজ করেছিস কি—'

'প্রেরণারা হতাহত হবে। জানি, আর বলতে হবে না তোমাকে।'

মাসিমার পিছু পিছু পা টিপে টিপে যাই। দরজার আড়াল থেকে উঁকি মারি। দেখি যে, মহিলাটি মাসিমারই ঝরনা-কলমটি বাগিয়ে মেসোমশায়ের রাইটিং প্যাডে ফস্ ফস্ করে লিখে চলেছে। পাতার পর পাতা—অব্যাহত প্রেরণায়।

সেই প্রেরণার আওতা থেকে অব্যাহতি পেতে আবার তেমনি পা টিপে টিপে ফিরে আসি।

'চোখে দেখে আর কি হবে মাসিমা? চেখে দেখলে তো বুঝতাম। মানে, তোমার ঐ রাঁধুনীর রচনা নয়, তার রান্না চাখবার কথাই বলছি। তোমার সেই সারে গামা পাধানি না খেয়ে আজ নড়ছি না এখান থেকে।'

'খাবি। খাবি বইকি, খাওয়াবো বইকি। বল্ না, তুই কী খেতে চাস? কি রকমের খানা তোর পছন্দ? সব রকমের খাবার ওর জানা আছে। চীনে, কোচিনে, কাবুলি কি বেলুচি—'

'না মাসিমা, বেলুচি ভোজে আমি রাজী নই। তবে হ্যাঁ, লুচির বদলে যদি পোলাও হয়···কিন্তু সে পরে হবে···আজকে কেবল সারে গামা পাধানি!'

'খাবি, খাবি বইকি! সময় হলেই খাওয়াবো। সত্যি বলতে, সেই সারে গামা খাবার সুযোগ আমাদেরই এখনো হয়নি।'

'সে কি মাসিমা? সে কি কখনো হতে পারে?' সর্বময় এই সরসতার সম্মুখে এতখানি নিরাসক্তি আমার বিশ্বাস হয় না।

'ফুরসৎই হয়নি ওর। এসে অব্দি লিখছেই তো খালি। ওর কোনো দোষ নেই। ফাঁক পেলে তো রাঁধবে? ক'মাসই বা এসেছে বল্।' তিনি সাফাই দেন।—'ওর সৃষ্টির প্রেরণাকে তো

তাই বলে জবাই করা যায় না। বাধ্য হয়ে আমাকেই দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলতে হচ্ছে এখনো।'

'আর মাস মাস তুমি মাইনে গুনে যাচ্ছো? এক শ' এক শ' করে'?'

'এক শ' টাকায় কি এই বাজারে রাঁধুনী মেলে রে? আর এমন লিখিয়ে পড়িয়ে রাঁধুনী! ক' জনের বাড়ি আছে এমনটা বল্ তো? তা বাপু, নাই বা ও রাঁধলো, যদি ওর আত্মজীবনীতে আমার আর তোর শালুমেসোর কথা একটুখানি লেখে তাহলেই হবে। সেই ঢের। তাতেই আমরা বর্তে যাবো। অমর হয়ে থাকবো ওর রচনায়।'

'কিন্তু মাসিমা, না খেয়ে অমর হওয়ার চাইতে খেয়ে মরা ঢের ভালো।' পামরের মতোই আমি বলি।

'তোর যেমন কথা! খালি খাই আর খাই! এই বাজারে ঝি-রাঁধুনীর সঙ্গে মানিয়ে চলা কি চাট্টিখানি নাকি? জানিস, ওর জন্যে পাড়ায় আমাদের কতখানি পজিশন হয়েছে?'

লুপ্ত অকার

স্মরীতা একটু সকাল সকালই বেরুলো। হয়তো এই সাড়ে ন'টাতেই গিয়ে দেখবে আপিসের দরজায় মেয়েরা জমাট। আবেদনকারিনীর গাঁদি জমে গিয়েছে। চাকরির বাজার যা হয়েছে আজকাল!

আজ সকালের কাগজেই লেডি টাইপিস্টের কর্মখালিটা দেখেছে। দেখেই দৌড়েছিলো মঞ্জুশ্রীর কাছে। মঞ্জু সেই আপিসেই কাজ করে কিনা। টাইপিস্টের কাজ।

মঞ্জু যে-খবর দিলো তা মোটেই মন-মজানো না। আপিসের তরুণ মনিব তেমন সুবিধের লোক নন। কেমন যেন—কিরকমের যেন…! কথাটা মঞ্জু খোলসা করে না বললেও যেভাবে ভাঙলো তাতে জোড় লাগাবার কিছুই রইলো না। জোর পাবার মতোও নয়।

মাসছয়েকও কাজ হয়নি মঞ্জুর, এর মধ্যেই সে ইস্তাফার কথা ভাবছে। এবং সে-ই প্রথম নয়, তার আগেও, তাদের জানাশোনা আরো কয়েকটি মেয়ের নাম করলো সে, যারাও নাকি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

'তুই ছেড়ে দিয়েছিস নাকি?'

'না দিলেও, তা প্রায় দেবার মতোই। হাবে ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি যে…মনে হচ্ছে তার আঁচ পেয়েই এই কর্মখালির বিজ্ঞাপনটা দিয়েছে আজকের কাগজে।'

কোনো ডিসেণ্ট মেয়েরই নাকি ও-আপিসে পা বাড়ানো উচিত নয়। কিন্তু গরজ বড় বালাই। এমন স্থল বহুৎ আছে যা পা দেবার উপযুক্ত নয়, কিন্তু সেখানেও পদলোভী মানুষ যায়। বিপদে পড়ার, অপদস্থ হবার ভয় সত্ত্বেও যায়।

চন্দ্রলোক তো পা বাড়াবার মতো জায়গা না, কিন্তু তাই বলে চাঁদে হাত বাড়ায় না কে?

যার নাকি দায়, এখনি গোড়াতেই তার বিদায়লাভের কথা ভাবলে চলে না। দশমীতে বিজয়া, তা ঠিক; কিন্তু তাই বলে সেই ভেবে এখনি দশা পাবার কোনো মানে হয় না। তার আগে এখন সপ্তমীতে, অধিকরণের কথা ভাবাটাই ভালো। সেজে গুজে তৈরি হলো রীতা।

চুলগুলোকে ফাঁপিয়ে মনোহারিনী খোঁপা বেঁধেছে সে। সাপকে যেন খোপে বেঁধেছে। কাজলের একটু রেখাও টেনেছে বুঝি দু' চোখে। বেশবাসে আর সুবাসে সশস্ত্র হয়ে বেরিয়ে পড়েছে সে সকাল সকাল।

সাড়ে ন'টার আগেই পৌঁচেছে আপিসটায়। কিন্তু কই, এখনো কোনো কর্মপ্রার্থিনীর তো দেখা নেই? আপিসঘর তো ফাঁকা। বাচ্চা বেয়ারাটা ঝাড়ন হাতে ঝাড় পোঁছ করছে টেবিল চেয়ারের।

মঞ্জুর কথা তাহলে মিথ্যে নয়। আপিসটার খ্যাতির সৌরভ বেশ ছড়ানোই। লেডি টাইপিস্টের মহলে জানতে কারো বাকি নেই বোধহয়।

নির্জন আপিসের এক কোণে একটি যুবক একখানা চিঠি

টাইপ করছিলো। একটু আগুপিছু করে স্মরীতা সেইদিকে এগুলো।

আপিসের সেই ধারেই কর্তার কামরা। কামরার দরজার একটা পাল্লার গায় সোনালি হরফে কর্তার নাম—দীপক রায়। অন্যটায়—প্রাইভেট।

ফলকটার দিকে এক পলক চেয়ে রীতা একটু হাসলো। হেসে শুধালো—'মিঃ রয় এখন আপিসে নেই বোধহয় ?'

'ঠিক এই মুহূর্তে নেই।' উত্তর দিলো যুবক।

'তাহলে একটু অপেক্ষা করা যাক।' বলে রীতা টাইপিস্ট যুবকের সামনের চেয়ারটি দখল করলো।

'বসুন না!'

'একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করতে পারি—যদি কিছু না মনে করেন—?'

'কী জানতে চান বলুন ?' জবাব এল যুবকের।

'আচ্ছা, ভদ্রলোকটি কেমন ?' জিগ্যেস করে রীতা, 'এই মিঃ রয় ?'

'দীপক রায় ? কেন বলুন তো ?'

'মানে, আমি লেডি টাইপিস্টের কাজটার জন্যেই এসেছিলাম।' একটু ইতস্তত করে সে বলে : 'কিন্তু দীপকবাবুর নামে যেসব কথা শুনেছি—'

'কী সব কথা ?'

সরাসরি কথাটা পাড়া উচিত হবে কিনা, রীতা ভাবে ; কিন্তু মঞ্জুর কথাগুলো তো তার বাজিয়ে নেয়া উচিত। সত্যিই যদি

কোনো ভদ্রমেয়ের এখানে কাজ করা সহজ না হয়···কাজটা যাচ্ঞা করার আগেই···যাচিয়ে নেয়াটা কি ঠিক নয়? আর তা জানতে হলে সেই আপিসের কারো কাছেই তো জানতে হয়। অবশ্যি, লোকটি অচেনা, কিন্তু তা হলেও সহযোগী টাইপিস্ট হিসেবে একরকম তার সগোত্রই তো? একজন টাইপিস্টকে আরেকজন ঐ, না দেখিলে কে দেখিবে?

তাহলেও কথাটা পাড়তে গিয়ে কেমন যেন তার বাধো বাধো লাগে।

'আগে এখানে মিস্ দত্ত কাজ করতেন না?' কথাটার পাড়ায় সে একটু ঘুর-পথে যায়।

'হেনা দত্তের কথা বলছেন? অদ্ভুত যার চোখ? কালো কালো আর টানা টানা?'

'হ্যাঁ, সেই হেনা। আমরা এক কলেজে পড়েছিলাম। কিন্তু মাস দুয়েকের বেশি টেকেনি নাকি সে এখেনে?'

'হ্যাঁ, দু' মাসই হবে মনে হয়।' যুবকটি মাথা নাড়ে। 'বোধহয় আরো ভালো চাকরি পেয়েছেন আর কোথাও?'

'তারপর কণিকা গাঙ্গুলি? সেও এখানে কাজ করতো না? কিন্তু বোধহয় বেশিদিন—'

'বড় জোর মাসখানেক—কিম্বা—না, তাই হবে।' যুবকটি হিসেব করে জানায়: 'বোধ হয় এখানকার কাজের চাপ একটু বেশি বলেই—'

'কাজের চাপ? কাজের চাপে পেছপা হবার মেয়ে কণা নয়—'

'তবে কি আপনি বলছেন যে অন্য কিছুর জন্যই—'

'তারপরে মঞ্জুশ্রী মিত্তির। তিনি—তিনিও তো নাকি ইস্তফা দিয়েছেন শুনেছি।'

'দিয়েছেন নাকি? কই, আমি তো এখনো জানিনে।' যুবকটি একটু অবাক হয় এবার—'দিলে অন্তত আমি তো টের পেতাম।'

'দেননি, তবে সে দেবার মতোই। তিনি আর এমুখো···মানে, এ-আপিসের ছায়া মাড়াবেন না আর।'

'আরো ভালো কাজ পেয়েছেন নিশ্চয় আর কোথাও?' যুবকটি আঁচ করে।

'আরো ভালো কাজ আর কোথাও পেয়েছেন কিনা জানিনে, তবে যেজন্য ছাড়ছেন তা আমি জানি।'

'কী জন্য বলুন তো?' যুবকটির কৌতূহল হয়।

'ঐ দীপকবাবুর জন্যই। ভদ্রলোক—ভদ্রলোক একটু—' ভদ্রলোকের সম্বন্ধে ওর বেশি বলতে পারে না রীতা।—'কিন্তু মঞ্জুশ্রী খুব কড়া মেয়ে···ওকে পারা সহজ নয়।'

'ও, ভদ্রলোকের এদিকে একটু ইতর-বিশেষ আছে বুঝি?' বলে কথাটার খোলা ছাড়িয়ে আরেকটু বুঝি সে খোলসা করে, 'তিনি একটি ইতর-বিশেষ? এই তো আপনার বলবার?'

'তা আমি বলতে চাইনে। তবে যা সব আমি শুনেছি ওঁর সম্বন্ধে—'

'কিন্তু ভুল শুনতেও তো পারেন মিস্—মিস্—?'

'মিস্ রীতা গুহ।'

'মিস্ গুহ, যতটা আপনি শুনেছেন ততটা খারাপ হয় তো তিনি নাও হতে পারেন?'

'আপনি দেখছি একজন আদর্শ চাকুরে—বেশ প্রভুভক্ত।' স্মরীতা বলে: 'ভক্তি জিনিসটা খারাপ নয়, কিন্তু তা অন্ধ হলেই মারাত্মক…'

এমন সময়ে কুমারী মঞ্জুশ্রী মিত্র পল্লবিনী লতার মতো ভ্যানিটি ব্যাগের সঙ্গে নিজেকে দুলিয়ে নিয়ে সেখানে সঞ্চারিত হলো—'মিস্টার রয়, আজ—আজও বুঝি লেট হয়ে গেল আসতে আমার? ওমা, রীতা যে? তুমি—তুমি বুঝি সেই কাজটার জন্যেই—তা এর মধ্যেই দেখছি তোমাদের বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছে?'

'অ্যাঁ, ইনি—ইনিই দীপকবাবু? আপনি—আপনিই মিস্টার রয়? কী সর্বনাশ!' রীতা যেন একটা ধাক্কা খায়।

'সর্বনাশের মতো কিছুই হয়নি মিস্ গুহ। বসুন, উঠছেন কেন?' দীপক বলে।

'না, যাই আমি। মঞ্জু কাজ ছেড়ে দেবে ভেবেই আমি এসেছিলাম, কিন্তু—কিন্তু—'

'কিন্তু কিন্তুর কিছু নেই। মঞ্জুশ্রী দেবী কাজ না ছাড়লেও আপনার এখানে আসার কোনো বাধা নেই। আমাদের আপিসে কাজের চাপ একটু বেশি। সেইজন্যেই আরেকটি লেডি টাইপিস্টের দরকার ছিলো আমাদের। সেটা মঞ্জুশ্রী দেবীকে ছাড়িয়ে নয়। আপনার যদি অন্য কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে আপনি আজ থেকেই এখানে লাগতে পারেন।'

'ধন্যবাদ, মিস্টর রয়! ধন্যবাদ!' দীপকের মহানুভবতায় রীতার বিস্ময়মূক কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদে মুখর হয়ে ওঠে।

দীপকের কামরার সামনেই মঞ্জু আর রীতার টেবিল—একেবারে মুখোমুখি। আপিসের বড় হল্‌টায় আর সবার থেকে দূরে। টিফিন্‌-পর্বের শেষে গল্প চলছিলো দুজনের।

'যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি তুই! কিন্তু না ভাই, দীপকবাবু অতটা খারাপ নয়। তেমন ভয়াবহ নন্‌—'

'ভয়াবহ কি বলেছি আমি?' মঞ্জু প্রতিবাদ করে।

'তা না হলেও ওঁর একটা জিনিস কিন্তু ভাই আমার যেন কেমন লাগে,' রীতা বলে, 'কিরকম যেন লাগে আমার।'

মঞ্জু কোনো কথা না তুলে কেবল চোখ তোলে।

'সবই ভালো ভদ্রলোকের, শুধু ঐ একটুকুই যা···!' বিষয়টা ওর বেশি বিশদ করে না রীতা। করতে পারে না।

দীপকের কামরার ঘন্টি বেজে ওঠে। বাচ্চা বেয়ারাটা ছুটে গিয়ে ঢোকে, তেমনি ছুটে বেরিয়ে আসে আবার—

'টাইপ-দিদিমণিকে বোলাচ্ছেন সাহেব।'

'তুই যা।' রীতা বলে, 'পরের ক্ষেপে আমি যাবো। একটু জিরিয়ে নিই ততক্ষণ।'

টিফিনের পরের প্রথম চোটটা মঞ্জুশ্রীর ওপর দিয়েই যাক্‌।

নোট-বই আর পেন্সিল নিয়ে মঞ্জুশ্রী যায়।

সব-ভালো দীপকের সেই একটুখানি খুঁৎ যে কোথায়, ভাবতে

ভাবতে যায় মঞ্জু। আর সেই-খুঁতে খুঁৎ খুঁৎ করার মতন এমন কি হলো স্মরীতার সে কথাটাও সে ভাবে।

খান ছয়েক চিঠির নোট দিয়ে দীপক বলে—'এখন এই থাক্, মিস্ মিত্তির। এখনকার মতো এই যথেষ্ট।'

নোট-বই হাতে বেরিয়ে আসে মঞ্জু। নিজের টেবিলে বসে গিয়ে।

'কী হলো?'

'কী আবার হবে? নোট নিলাম।'

নোটগুলি সে টাইপ করতে লাগে। একটু বাদে আবার বেজে ওঠে বড় কামরার ঘন্টি। আবার সেই বেয়ারাটা এসে জানায়—'টাইপ দিদিমণিকে সাহেব বোলাচ্ছেন।'

এবার রীতাই ওঠে। মঞ্জু চিঠি টাইপ করছে।

নোট নিয়ে বেরিয়ে আসে রীতা, মুখখানা যেন কিরকম করে'। কী যেন ভাবতে ভাবতে আসে। ঘাড় নিচু করে বসে তার টাইপ-রাইটারের সামনে। চুপটি করে বসে থাকে, কাজে হাত দেয় না।

'কী হলো?' জিগ্যেস করে মঞ্জু।

'নাঃ, দীপকবাবুর এই জিনিসটা…নাঃ…!'

'কী! কোনো খারাপ ব্যবহার করলো নাকি?'

'না। খারাপ কিছু নয়।' রীতা জানায়, 'কিন্তু দীপকবাবুর এই জিনিসটা আমার একদম ভালো লাগছে না।'

রোজই টিফিনের পর রীতার এই এক রীতি। দীপকের প্রথম ডাকটা সে ওজোর দিয়ে এড়ায়। মঞ্জুকেই যেতে হয় রোজ।

আর তার পরের ক্ষেপে রীতু নোট নিতে গিয়ে তেমনিই মুখ ভার করে ফিরে আসে।

মঞ্জু দীপকের কত গল্প করে রীতার কাছে। কোনোদিন তার সঙ্গে সিনেমায় গেলে কি রেস্তোরাঁয় খেলে স্মরীতাকে তা জানাতে সে দ্বিধা করে না। কিন্তু রীতা শুধু চুপ করে শোনে। কী যেন ভাবে সে সব সময়। দীপকের কোনো কথাই সে বলে না। বলতে গেলে, তার সম্বন্ধে ঐ একটুখানি খুঁৎখুঁতুনি ছাড়া আর কিছুই যেন রীতার নেই।

মঞ্জুও এক-এক সময় ভাবিত না হয় যে তা নয়। কেমনটি হলে দীপক ঠিক নিখুঁৎ হতো, সেই ভাবনাই কি? কে জানে! অবশেষে অভাবিতভাবে একদিন দীপকেরও যেন সেই ভাবনাই দেখা দিলো।

'একটা কথা জিগ্যেস করবো তোমায়? অবশ্যি, যদি কিছু না মনে করো?' নোট দেয়ার ফাঁকে দীপক বললো একদিন।

কিছু না বলে মুখ নামিয়ে রইলো মঞ্জু।

'আমাকে তোমার কেমন লাগে?' শুধালো দীপক।— 'সত্যি করে বলবে।'

'কোনো মেয়ের তো আপনাকে মন্দ লাগবার কথা নয় দীপকবাবু!' জবাব দিয়েছে মঞ্জুশ্রী।

'সুখী হলাম শুনে। কিন্তু কোনো কোনো মেয়ের তো লাগতে পারে—মানে, আমি দেখেছি কারো কারো আমাকে···তাদের যেন কেমন একটা···' 'ব্যক্তিনী'-গত অপছন্দের কথাটা প্রকাশ করার পছন্দসই কথা সে খুঁজে পায় না—'তারা ঠিক আমায়, মানে,

তাদের কেউ কেউ···সেকথা তারা মুখ ফুটে না বললেও কথাটা তাদের মুখে ফুটে ওঠে। আমি দেখেছি।'

'সে আপনাকে নয়। আপনার একটা জিনিস তারা ঠিক···'

'কী সেটা বলবে? তোমাকে নিতান্ত বন্ধু মনে করি বলেই তোমার কাছেই জানতে চাচ্ছি।'

মঞ্জু বলে কথাটা।

'ও, এই!' হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয় দীপক। উচ্চকিত করে তুলে মঞ্জুকে।—'কিন্তু এই লুপ্ত-অকার হওয়াটা কি বাঞ্ছনীয় হবে? তাতে কি ভালো দেখাবে আমাকে?'

দীপক কথাটা ভাবে। দেহের মধ্যেও স্বরবর্গ ব্যঞ্জনবর্গ আছে। চোখ কান ইত্যাদি স্বরেরা স্বপ্রধান, এদের কাজ হচ্ছে হাত-পা প্রভৃতি ব্যঞ্জনদের ব্যঞ্জনা দেয়া। স্বরে অ যেমন, আরেকটি অ-এর সঙ্গে জোড় লেগে জোরালো হয়, সংযুক্ত হয়ে আকারে দাঁড়ায়, তেমনি একটি চোখ, একটি কান আরেকটির যোগেই পূর্ণাকার। একক ওদের কোনো দাম নেই। একটি ওদের লুপ্ত হওয়া—সে—যে ভারী বিশ্রী!

অবশ্যি, মঞ্জু যেকথা বলেছে তা ঠিক স্বরবর্গের মধ্যে পড়ে না। ব্যঞ্জনবর্গের মধ্যেও নয় হয়তো। বরং যেখানে দেহের স্বর আর ব্যঞ্জন উভয়ে এসে মিশেছে, অ উ ম-এর মতো মিশ খেয়েছে একাধারে—এক অনাহত মিশ্রণে, অপরূপ বিস্ময়ের প্রনব-নব-রূপের সীমাহীনতায়—মাধুর্যের সেই মোহনার কাছাকাছিই এই এক মোহ। বুঝি আরেক মোহ।

ঠিক এক নয়। একে দুই। দুইয়ে এক। ব্রহ্ম আর শক্তির

মতোই অচ্ছেদ্য। এদের একটাকে ফেলে আরেকটাকে রাখা যায় না। কিন্তু মঞ্জু যখন বলছে···বন্ধুহিসেবেই বলছে···যথার্থ মিত্রের মতোই বলছে যখন···তখন এই মহিমা···।

পরদিন আপিসে স্মরীতাকে যেন একটু চমৎকৃতই দেখা গেল। তার মুখের সেই গুমোট নেই, মনের মোট যেন নেমে গিয়েছে কখন! আর, দীপকের বিষয়ে তার সেই মন্তব্যও শোনা গেল না। হঠাৎ যেন তার খুঁৎখুঁতেপণাটা কোথায় পালিয়েছে!

টিফিনের পর বেয়ারা যখন দিদিমণিদের জন্য তলব নিয়ে এল তখন রীতাই উঠে দাঁড়ালো—'আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি না হয়।'

মঞ্জুকেও চমৎকৃত হতে হলো এবার। কিন্তু আরো চমৎকারের বাকি তার ছিলো বুঝি···

তার দিনকয়েক পরে টাইপিস্টের টেবিলে মঞ্জু একলাটি বসে। রীতা আসেনি। আর আসবেও না সে। টাইপিস্টের চাকরি তার খতম।

একলা বসে আছে মঞ্জুশ্রী। কাজের কোনো চাপ নেই, তলবের তাড়া নেই কোনো। দীপক রায় আসেনি আপিসে। ক'দিন থেকেই আসছে না। এক মাসের ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছে দার্জিলিং—নিজের নববিবাহিতার সঙ্গে মধুচন্দ্রিমায়।

গত রবিবার দীপকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে রীতার। তাকে আর টাইপিস্টের কাজ করতে হবে না। এ জন্মের মতো নয়।

করতে হবে মঞ্জুকে। জীবনভোরই করতে হবে হয়তো।

কিন্তু দোষ তো ওরই। বিযুক্ত হলে দীপক যে আরো শ্রীযুক্ত হবে, এ-বুদ্ধি কে তাকে দিয়েছিলো? সে নিজেই তো! নইলে এই কণ্টকিত গোলাপটিকে সে নিজের খোঁপাতেই গুঁজতে পারতো। কুমারীত্বের থেকে, দ্বিত্বলাভে, পত্নীত্বের আকার নিতে গিয়ে নিজের চোটে নিজেই সে লুপ্ত-অকার হয়ে রইলো!

আর এর জন্যে দায়ী সে নিজেই। রীতার বাধা ঠিক কোথায়, কিসের বাধা অপসৃত হলেই সে···সেটা বেশ ভালো জেনেই মঞ্জু নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছে। দীপকের খোঁচা খোঁচা গোঁফের চুটকি কামিয়ে ফেলতে বাতলেছিলো কে? মঞ্জুই তো!

ইতু থেকে ইত্যাদি

বাজার করতে বেরুনো শালুমাসির কাছে ছিলো একটা অভিযান। প্রায় এভারেস্ট অভিযানের মতোই ; চূড়ায় না পৌঁছে বিশ্রাম নেই। দামের দিক থেকে যত চড়াই থাক না, একেবারে চূড়ান্ত না করে ছাড়বার যো নেই। মাঝখানে থামার যেন কোনো উপায় ছিলো না তার।

তার কারণ তাঁর চক্ষুলজ্জা। কোনো জিনিস একবার হাতে নিলে, পছন্দ হোক বা না হোক, কিনতে তাঁকে হতোই। ঐ চক্ষুলজ্জার খাতিরেই। দোকানে দাঁড়িয়ে ঠিক পছন্দসই না হলেও, কিনতে তিনি বাধ্য হতেন। তার কোনো দরকার থাক বা না থাক, কাজে লাগুক বা না লাগুক, সেখান থেকে কিছু একটা না কিনে ফিরতে পারতেন না কিছুতেই।

এইজন্যেই, কোথাও কেনাকাটার কাজে গেলে কাউকে সঙ্গে না নিয়ে কখনো তিনি বেরুতেন না। কেনার সঙ্গে কাটা, কেন যে সর্বদা অচ্ছেদ্যভাবে দ্বন্দ্বসমাসে জড়িয়ে, দোকানদারের পাল্লায় পড়লেই সেটা মালুম হয়। সেই পাল্লায় দাঁড়ি টানবার জন্যেই একজনকে তাঁকে সঙ্গে নিতে হতো।

কাটারিটা যে কেবল দোকানদারের হাতেই থাকতো তা তো না, তাঁর নিজের মনেও ছিলো যে! দোকানীরা ডাকিনী যোগিনীরূপে প্রলুব্ধ করতো বই কি, তাদের ডাকে আর উদ্যোগে

সাড়া না দিয়ে যো ছিলো না তাঁর, কিন্তু তাছাড়াও তাঁর নিজেরও ছিলো ছিন্নমস্তারূপ। নিজের গলায় নিজেই কোপ বসাতে জুড়ি ছিলো না শালুমাসির।

এই কারণেই তিনি মিনিকে সাথে নিয়ে বেরুতেন। তাঁর হাত থেকে তাঁকে বাঁচাবার দায়িত্ব ছিলো মিনির। বাজার করতে বেরুলে দোকানীর চোট তো রয়েছেই, তার ওপরে ফের নিজের খর্পরে পড়ে যাতে তিনি না কাটা পড়েন সেদিকে মিনিকে নজর রাখতে হতো।

নজর রাখতো মিনি। ইসারায় জানাবার একটা অলক্ষ্য কৌশল ছিলো শালুমাসির—সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সেই মতন তাকে সায় দিতে হতো। শালুমাসি যদি একটা শাড়ি দেখতেন, আর শাড়িটা তাঁর মনে লাগতো তাহলে তিনি ডান হাতের কড়ে আঙুলটি নাড়তেন—অমনি মিনিকে সেই-শাড়ির সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে হতো। 'কী সুন্দর শাড়িটা শালুমাসি! কী চমৎকার যে তোমায় মানাবে!' বলতে বলতে উথলে উঠতো সে। শালুমাসি তখন যেন বোনঝির কথাতেই দায়ে পড়ে শাড়িখানা কিনতেন।

আর যদি সেই শাড়িটা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখেও শালুমাসির মনে ধরতো না, তিনি বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটি নাড়তেন। তাহলে মিনি তখন শাড়ির দিকে তাকিয়ে মুখ ভার করতো, হয় তার পাড় খারাপ, নয় তো জমিটা বাজে, কি রঙটা ক্যাট্‌কেটে—এমনি হাজার খুঁৎ বার করতো শাড়িটার। বোনঝির না-পছন্দে তখন যেন বাধ্য হয়েই শাড়িটা ছাড়তে হতো

শালুমাসিকে। নিজের মান বাঁচিয়ে চক্ষুলজ্জা বজায় রেখে নিরাপদে তিনি বেরিয়ে আসতে পারতেন।

বন্দোবস্তটা ছিলো ভালোই। আর চলছিলও নিখুঁৎ-রকম। মিনিকে নিয়ে বেরিয়ে কখনো তাঁকে কোনো বেগ পেতে হয়নি। নিরুদ্বেগে কেনাকাটা করেছেন। যা কেনার মতো কিনেছেন, যেটা কাটাবার, স্বচ্ছন্দে তার পাশ কাটিয়েছেন। কিন্তু মুস্কিল হলো একদিন। ডালুমাসির কি কাজে আটকা পড়ে মিনি একবার সঙ্গী হতে পারলো না। আমার বোন ইতুকে নিয়ে তিনি বেরুলেন। দোকানীদের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে একলা নামার চাইতে অন্তত আরেকজনকে নিজের পার্শ্বরক্ষিনী না করে এগুতে তিনি সাহসী হলেন না।

'ইতুরাণী কই গো আমার?' শালুমাসির গলা পাওয়া যায়। যেন আদরে গলে যাওয়া।

'ইতুচন্দর্!' আমি হাঁক পাড়ি: 'শালুমাসি ডাকছেন তোমাকে।···কিন্তু মাসিমা, ইতুকে নিয়ে বাজারে গিয়ে তুমি সুবিধে করতে পারবে না। ভারী বিপদে পড়বে। কারো অঙ্গুলিহেলনে চালিত হবার মেয়ে নয় ও।'

'না, তা কি!' ইতুর সুখ্যাতিতে মাসিমা উথলে পড়েন: 'আমার ইতুর মতো মেয়ে আর হয় না! রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।'

'গুণে? গুণে ভীষণ কাঁচা।' প্রতিবাদ করতে হয় আমায়: 'তবে হ্যাঁ, ভাগের কথা যদি বলো, তাতে খুব সিদ্ধহস্ত। সন্দেশ টন্দেশ কেক টেক চকোলেট টকোলেট—এসব ওকে ভাগ করতে দিয়ে দেখতে পারো।'

বলে আমি একটা দৃষ্টান্ত দিতে যাই—'ঈশপের গল্পে বাঁদরের পিঠে-ভাগের কথা তো জানো—'

পিঠের কথা শেষ না হতেই মাসিমা আমার কথার পিঠে আঙুল তোলেন—'যাঃ, বাজে বকিসনে। ইতু তোর চেয়ে ঢের সেয়ানা! তোর মতো দশটাকে এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচে আসতে পারে।'

বলে তাঁর তর্জনের সুর তর্জনীর থেকে নামিয়ে কড়ে আঙুলে এনে আমার চোখের ওপর খাড়া করেন—'এই তো ওকে নিয়ে বাজার করতে চললুম! ফিরে এলে দেখতে পাবি, কেমন বাজার করেছি! দেখিস তখন।'

মাসিমার ইতুপূজোর বহরে আমি চুপ করে যাই। ইতুর ইতিহাসের আর কিছু তাঁকে বলিনে। দৈনন্দিন সেই সব ঐতিহাসিক খুঁটিনাটি চেপে যাই বেমালুম।

এমনিতে মেয়েটি বেশ। কিন্তু তাকে আরো বেশ করার চেষ্টা করলে সেই বেশ তার পক্ষে বোঝা হয়। বিশেষ করে উচ্চগণিত তার মাথায় আদৌ প্রবেশ করে না। আঙুলের সাহায্যে গোণাই তার আসে না, তার ওপরে আঙুলকেই গণনা করতে বলা—যেটা আবার আঙুলদের মধ্যে নগণ্য—শেখাতে শালুমাসির বেশ একটু সময় গেল। তাহলেও বোঝাতে কসুর করলেন না শালুমাসি।—'এইটা। এই ডান হাতের কড়ে আঙুলটা। দেখতে পাচ্ছিস তো? ভালো করে চিনে রাখ। এটা যখন আমি নাচাবো তখন বুঝবি যে জিনিসটা আমার পছন্দ হয়েছে। আর এইটে—আমার বাঁ হাতেরটা—বুঝেছিস—'

'অনেকক্ষণ। এখন চলো তো বাজারে।' ইতুর উৎসাহ ধরে না।

ভালো করে বুঝিয়ে সমঝিয়ে ইতুকে নিয়ে তো তিনি বেরুলেন। ইতুও বেশ করে বুঝে নিয়েছিলো। ডান হাতেরটা নাড়লে পছন্দ আর বাঁ হাতেরটা নাড়লে না-পছন্দ—আউড়ে নিয়েছিলো বার বার। কিন্তু মুখস্থ বিদ্যে পরীক্ষার সম্মুখস্থ হলেই যেন গুলিয়ে যায়। পরহস্তগত ধনের মতো তা আর হাতে মেলে না। শালুমাসির সঙ্গেও তার হাতে হাতে মিললো না।

মুখোমুখি দাঁড়ালে শালুমাসির ডান হাত যে তার নিজের ডান হাতের বরাবর না, এক লাইনে হবার নয়, এটা ইতুর মাথায় ঢোকেনি।

ফলে গোল বাধলো গোড়াতেই। এতদিনের অকাট্য শালুমাসিকে কাটা পড়তে হলো একটু না আগাতেই···

জর্জেটের কালো শাড়িটা শালুমাসির ভারী মনে ধরেছিলো। সেটা হাতে নিয়ে হাসিমুখে ইতুর দিকে তাকিয়ে তিনি আঙুল নাড়লেন। ডান হাতের কড়ে আঙুল। কিন্তু তাঁকে আকাশ থেকে পড়তে হলো ইতু যখন মুখ ভার করে ঘাড় নাড়তে লাগলো।

'না শালুমাসি! এ শাড়ি তোমার ঐ ফর্সা রঙে মোটেই মানাবে না। তবে তুমি যদি পাড়াগাঁয় যাও আর ঘুটঘুটি অমাবস্যার রাতে এই পরে বেরোও তো সেই অন্ধকারে হয়তো খাপ খেয়ে যেতে পারে। মিশমিশে কালো রাত্তিরে পেত্নী সেজে শ্মশানে মশানে ঘুরতে হলে হ্যাঁ, এই শাড়ি। কিন্তু কলকাতায় এ পরা চলবে না। কিছুতেই না।'

মনের দুঃখে শাড়িটা রেখে দিতে হলো শালুমাসিকে। দোকানদার আরেকটা শাড়ি এগিয়ে দিলো। হাবড়া হাটের না কোথাকার। আগাপাশতলা তার মৌচাকের নক্সা আর মৌমাছিদের ছুটোছুটি। শাড়িটার নাম নাকি মক্ষিরাণী।

মক্ষিরাণীকে হাতে নিয়ে মুখ ব্যাজার করে তিনি বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটি নাড়লেন।

কিন্তু ইতু সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে ডগোমগো—'ইস, কী সুন্দর শাড়িখানা! কী চমৎকার ডিজাইন! একেবারে নতুন ধরনের। এইটে পরলে তোমাকে মৌচাকরানী মৌচাকরানী দেখাবে।'

বাধ্য হয়ে নিতে হলো সেটা শালুমাসিকে। পরে শাড়িটা না পরেই তাঁকে বলতে শুনেছিলাম—'মৌচাকরানী না ছাই! গুষ্টির পিণ্ডি! যেমন জ্যালজেলে জমি তেমনি মাকড়সামার্কা নক্সা। ম্যাথরানীরা পরে ঐ শাড়ি। পরলে ঠিক ঝি চাকরানীর মতো দেখায়।'

এক দোকান থেকে আরেক দোকানে যাবার পথে কড়ে আঙুলের রহস্যটা ইতুকে আবার তিনি বিশদ করে বোঝালেন। ইতু আবার তার ঘাড় নাড়লো।

কিন্তু কানে কানে অত করে বোঝালে কি হবে, হাতে হাতে সেই এক ফল। দোকানে দোকানে সেই একই দশা। অনেক আজে বাজে জিনিস ঘাড়ে চাপলো শালুমাসির যা কোনোদিনই তাঁর কোনো কাজে লাগাবার নয়। তিত বিরক্ত হয়ে তখন তিনি নিশানা বদলালেন। তাতে যদি কাজ হয়। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের ইসারা ডান হাতের, আর ডান হাতেরটা বাঁ হাতের কড়ে

আঙুলকে দিয়ে সারতে চাইলেন। কিন্তু তাতেও কোনো সুরাহা হলো না। মাসিকে কিছুতেই খুসি করতে না পেরে ইতুও ততক্ষণে আঙুলের দিক পাল্টেছে। অন্যপক্ষে গিয়েছে।

এক-একবার শালুমাসির নিজেরই যেন গোল বাধে। ডান আর বাঁ হাত একাকার বোধ হয়। এক হাতের নাড়তে গিয়ে আরেক হাতের কনিষ্ঠাকে নেড়ে বসেন···

প্রকাণ্ড এক শিল্পবিপণিতে ঢুকেছিলেন তাঁরা। সারে সারে জিনিসপত্র সাজানো, সারিতে সারিতে ভাগ-করা। বিপণির এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগে যাচ্ছিলেন তিনি, আর ভাগ্য তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলো। কী-যেন তাঁর কেনার ছিলো আর কী সব তাঁকে কিনতে হয়েছে! বুদোর মতো উদোর পিণ্ডি ঘাড়ে নিয়ে—

ভাবতে ভাবতে যেন ক্ষেপে গিয়েই ইতুকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'কোনটা ডান হাত কোনটা বাঁ হাত শুনি?'

'তোমার না আমার?'

'ডান হাত বাঁ হাত কি এক-এক জনের এক-এক রকম হয় নাকি?'

'না, তা নয়, তা কেন হবে—'

'তবে? তবে কি? এটা আমার কোন হাত?' তিনি নিজের ডান হাত তোলেন।

'ওটা? ওটা তো তোমার—' ইতু ভালো করে দেখে-শুনে নিয়ে তারপরে ভেবেচিন্তে বলে: 'ওটা তোমার ডান হাত।'

'ডান হাত? এটা আমার ডান হাত?' তিনি যেন রাগে ফাটেন:

—'তাহলে এটা—এটা কি ?' বলে বাঁ হাত দিয়ে ইতুর গালে ঠাস করে লাগান।

শালুমাসির নিজেরই যেন ভুল হয়ে যায়। কোনটা তাঁর ডান হাত আর কোনটা বাঁ—তাদের কনিষ্ঠাঙ্গুলিসমেত সমস্ত যেন তিনি গুলিয়ে ফেলেন।

'কোন গালে মারটা লাগলো শুনি ?' তিনি জিগেস করেন রেগে মেগে—'শুনি তো একবার ?'

'ডান গালে।' চোখ মুছতে মুছতে ইতু জানায়।

'ডান গালে ?' এবার সত্যিই তিনি ক্ষেপে যান : 'ডান, বাঁ সব গুলে খেয়েছিস হতচ্ছাড়ি ? ডান হাত দিয়ে ডান গালে কি চড় মারা যায় কখনো ?' বলে তিনি বাঁ হাত দিয়ে নিজের বাঁ গালে আলতো করে একটু ছোঁয়ান—'হ্যাঁ। যায় তো। মারা তো যায়। আমিই তো মারলাম। কিন্তু এটা কি আমার ডান গাল ? আমার বাঁ হাত তাহলে কোনটা ? আমারও ডান বাঁ সব ছর্‌কুটে দিলে গা—ভালো ডাইনিকে সঙ্গে এনেছিলাম আজ !'

আর এই গোলমালের মধ্যে যদি তিনি কোনো কাউণ্টারে গিয়ে ভুলেও এক পলকের জন্যে একটু দাঁড়িয়েছেন অমনি সেখানে দোকানী তাঁকে বাধিত করার মতলবে এগিয়ে এসে, ইতুর সৌজন্যে, একটা না একটা অবাঞ্ছিত জিনিস তাঁকে গছিয়ে দিয়েছে।

অবশ্যি কেনাকাটায় বেরুলে লাভ লোকসান আছেই। মিনিকে নিয়ে কিনতে বেরিয়েই যে সব সময়ে তিনি জিতেছেন তা নয়। কিন্তু এমন ভীষণ হার কখনো তাঁর হয়নি। এমন বিভীষণের মার খেতে হয়নি তাঁকে এর আগে।

হবেই, জানা কথা। ইতু থেকেই ইত্যাদি। ইতি যদি আদিতে থাকে, সন্ধিসূত্রে, ইত্যাদিরা আসবেই। আর এইটে জানতে জানতেই, হাবরা হাটের সেই শাড়ি থেকে শুরু করে একটা হামানদিস্তা, কতকগুলো ইয়ো ইয়ো, (নানা রঙের) একখানা ঘোড়ার কম্বল, একটা পাঞ্চিং মেসিন, জমি জরীপের একটা যন্ত্র, একপ্রস্থ বাটখারা, আধখানা পাপোষ, দেড় গজ প্ল্যাস্টিক (কি কাজে লাগবে কে জানে!) একটা টাইপরাইটার (কেবল তিনি ঢাকনাটা তুলে একটু দেখতে গিয়েছিলেন মাত্র, সেই ফাঁকেই), এক জোড়া মুগুড় (কতটা ভারী তার আঁচ নিতে গিয়েছিলেন কেবল) খান চারেক স্পোর্টস্ শার্ট, আধ ডজন শালোয়ার, একটা ফুটবলের ইনফ্ল্যাটার—ইত্যাদি ইত্যাদিরা এসে গেল।

একটা চেস্ট এক্সপ্যাণ্ডারও এসে পড়েছিলো প্রায়, কিন্তু তার আগেই তিনি সেখান থেকে ভেসে পড়েছেন।

যেতে যেতে ইতু বলেছিলো—'নিলে না কেন শালুমাসি। ঐটে দিয়ে একজনকে আমি একসারসাইজ করতে দেখেছি। ওতে নাকি বুক খুব চওড়া হয়। কপাটের মতো চ্যাটালো হয় নাকি।'

শালুমাসি জবাব দিয়েছেন—হুঁ।

'শালোয়ারগুলোয় তোমায় এমন মানাবে শালুমাসি! অবশ্যি যদি তুমি পরো। মুগুড়গুলোও তোমার খুব কাজে লাগবে। মুগুড় ভেঁজে যদি তোমার চর্বিটা একটু কমিয়ে নাও আর তারপরে যদি ঐ শালোয়ার পরো—'

'হুম।' চর্বিত কথাটা মনে মনে চর্বন করতে করতে শালুমাসি শিশুদের খেলনা বিভাগে গিয়ে হাজির হলেন।

'গাধার টুপি আছে? গাধার টুপি পাবো একটা এখেনে?'

'গাধার টুপি?' দোকানী অবাক হয়ে তাকায়—'আজ্ঞে, কী বললেন?'

'গাধার টুপি তোমাকে মানাবে না শালুমাসি—' বলতে যায় ইতু—'তার চেয়ে যদি তুমি গান্ধী-ক্যাপ মাথায় দাও তো—'

'হ্যাঁ। আমার নিজের জন্যেই কিনছি কিনা!' বলে শালুমাসি আবার শুধোন: 'আচ্ছা, গাধার টুপি না থাক, ঘণ্টা? ঘণ্টা তো আছে? না না, পুরুত ফুরুতের না, পূজোর ঘণ্টা নয়। গরুর গলার ঘণ্টাই চাইছি।'

'পাবেন আমাদের কাছে। আগে থাকতো না বটে, কিন্তু আজকাল কলকাতার বাবুরা অনেকে তো গোরু পুষছেন বাড়িতে, তাঁদের শখ মেটাতেই রাখতে হয়েছে। স্টোরের জানোয়ারি বিভাগ থেকে আনিয়ে দিচ্ছি, দয়া করে বসুন একটুখানি। কী সাইজের চাই বলুন তো?'

'কী সাইজের? সেটা এই—এর কাছ থেকেই জেনে নিন। আমার এই বোনঝির মনের মতো হলেই হবে। ওর পছন্দেই আমার পছন্দ। ওর জন্যেই কেনা কিনা! ওর গলায় মানানসই হলেই হয়।'

এই বলে শালুমাসি কড়ে-আঙুল-ভ্রমে নিজের বুড়ো আঙুল নাড়তে লাগলেন। দু' হাতেরই।

স্বয়ম্বরা

কালের চাকা নিজের তালেই ঘোরে, কিন্তু তার চক্রান্তে যে কালীয় ওঠে, তাকে দমন করার মতো কোনো আয়ুধ মানুষের নেই। আয়ু শেষ হয়, কিন্তু তার ঢের আগেই যৌবন চলে যায়—আর, তার যায়-যায় বার্তাটা তিরিশ পেরুনোর থেকেই দাগ কাটতে থাকে মেয়েদের মনে। শুধু মনেই নয়, চোখের কোণে, কপালে, কপোলেও নিজের দাগা বুলোয়।

দাগাটা যেন আজ বেশি করে লাগছিলো মঞ্জুর মনে। একটু আগে ফোন করেছিলো রীতা। তাদের নববর্ষের প্রীতিসম্মেলনে সে যোগ দেবে কি না। শুনেই সে না করে দিয়েছে।

নতুন বছর! ভাবতেই তার বুক শিউরে ওঠে। নববর্ষ আর কোনো হর্ষই বয়ে আনে না মঞ্জুর কাছে। নতুন পাতার মতো নবরূপে তার শাখায় মঞ্জুরিত হয় না, মধুপের মতো সে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে না তার মনে। নববর্ষ মানেই আরেকটা বছর—আবার একটা বছর গেল। আরো একটা বছর!

মঞ্জুর মন হু হু করে ওঠে—অকালবৈশাখীতে। জীবনের পরিচ্ছেদে—সর্বশেষ ছেদের আগে এই আরেকটা কমা, আরো একটু কমা। সারা জীবনটাই তো এক ডেথ সেণ্টেন্স; কিন্তু তার দাঁড়ি কোথায়, কেউ জানে না। কিন্তু জীবন তো দাঁড়িয়ে নেই। দাঁড়িয়ে থাকবার নয়। কমা-তে কমা-তে এগিয়ে এগিয়ে

ক্রমে এক জায়গায় গিয়ে শেষ হয়। দিনের পর দিন কমে কমে একদিন একেবারে থেমে যায় হঠাৎ।

কিন্তু শেষের সে-দিনের ভাবনায় হু হু করে ওঠেনি মঞ্জুর মন।...একত্রিশ পেরিয়ে গেল, কিন্তু এখনো তো সেই একটির দেখা মিললো না ?

ঋতু-চক্রের যে রীতিই হোক, জীবনের পাতাঝরা শুরু হলে তারপরে আর বসন্তের দেখা নেই। পয়লা বোশেখের সম্মুখে বসে মঞ্জুর আজ নিজেকে বড্ডো—বড্ডো একা বলে মনে হয়।

বাইরে যত আধুনিকাই হোক না, মনের কোণে মঞ্জু সেই সেকেলে। তার স্বামী চাই। স্বামীর আশ্রয় চাই। তা না হলে নারীজীবনের দামই যেন সে পেলো না। আগে পরকে বেঁধে আপনার করা, ঘর বাঁধা। তারপরে পায়ের তলায় নিশ্চিত মাটিতে নির্ভর করে নির্ভয়ে শূন্য-বিচরণ। একের পাশে নিশ্চিন্ত থেকে তারপর এন্তার ফাঁকির খেলায় মাতো না, শূন্য কুড়াও অনেক, ইচ্ছে করো যদি। কিন্তু সেটা তারপরেই। একের দাক্ষিণ্যে সেসব শূন্যলাভও তখন মূল্যলাভে দাঁড়াবে।

ছেলে কি আসেনি মঞ্জুর জীবনে ? এসেছে। অনেক এসেছে, কিন্তু মনের কাছ ঘেঁষে নয়। মনোনীত করার মতো ছিলো না কেউ তাদের। কিন্তু আর নয়, আর বুঝি দেরি করা যায় না। মনের মতো না হলেও একজনকে মঞ্জুর না করলেই যেন নয় আর।

বর যদি স্বয়ং না আসে, বরং সে স্বয়ম্বরা হবে। স্বয়ম্বরণে বেরুবে নিজেই নাহয়। সে ছিলো এক যুগ, যখন রাজকন্যার স্বয়ম্বর-সভায় রাজপুত্ররা শোভাযাত্রা করে আসতো। রাজসূয় যজ্ঞের

মতোই। সেই যুবরাজ-সূয়ের ভেতর থেকে যোগ্যতমটিকে বেছে 'সুয়ো'-রাজা করে বাকিগুলোকে দুয়ো করে দিলেই চুকে যেতো। কিন্তু এখন আর সে রাজসূয় হয় না, এখন স্বয়ম্বরের অশ্বমেধে বেরুতে হয়।

বেরিয়ে পড়লো মঞ্জু। সেজেগুজে, মুখে একটু পাউডার ছুঁইয়ে কানের ধারে, ঘাড়ের পাশে আর বেশবাসে গন্ধসার ছড়িয়ে একটু। চললো অশ্বমেধের নিরুদ্দেশে।

কফিখানার দ্বারদেশে বিকাশের সঙ্গে দেখা।

'আরে, এসো এসো!' মঞ্জুকে দেখেই সে বিকশিত হয়: 'ভালোই হলো, নববর্ষের বউনিটা তোমার সঙ্গেই হোক তাহলে।'

'বউনি? তার মানে?' মঞ্জু কটাক্ষ হানে।

'মানে, নতুন খাতার মিষ্টিমুখ আর কি!' বিকাশ বলে: 'জীবনের খাতায় একটা নতুন পাতা খুললো তো আজ। মনে হচ্ছে বছরটা বেশ ভালোই যাবে। সকালেই তোমার ওই মিষ্টিমুখ দেখলাম।'

মঞ্জু খতিয়ে ছাখে, নিজের মুখের নেপথ্যে, মনের মধ্যে, বিকাশের জন্য কোনো মিষ্টতা তার সঞ্চিত আছে কিনা। খুঁজে পেতে ছাখে বুঝি। না না, কণামাত্রও নয়। এমনিতে বিকাশ হয়তো মন্দ নয়, কিন্তু চোয়াড়ে ধরনের এই আধগোঁয়ার ছেলেটিকে নিজের জীবনপথের···না-না, সেকথা ভাবতেই পারা যায় না!

কফিখানার চেয়ারে, বিকাশের সমুখে সে মুখ ভার করে বসে থাকে।

'বলি মঞ্জু, মুখখানা অমন হাঁড়িপানা করে রইলে যে? মুখ

তোলো, হাসো একটু। নইলে অমন প্যাঁচার মতো মুখ গোঁজ করে বসে থাকো যদি, লোকে ভাববে আমি তোমাকে কোথেকে বুঝি ফুসলে নিয়ে এসেছি।'

'বলি বিকু, একটা কথা বলতে পারো আমায়? তোমার সঙ্গেই ঘুরে ঘুরে কেন আমার দেখা হয়?' মঞ্জুর গলার থেকে বরফ গলে: 'কত মেয়ের কেমন ডিসেণ্ট ছেলে-বন্ধু রয়েছে, আমার পোড়া বরাতে কি একটিও তেমন জুটতে নেই। তোমার মতন বাজে লোকের সঙ্গেই মিশতে হয় আমাকে!'

'মিথ্যে বলোনি! কিন্তু আমার মতো অপদার্থেরও হৃদয় বলে একটা জিনিস আছে।' বিকাশের স্বরে সমবেদনার সুর: 'বিশ্বাস করো, তোমার জন্যে সত্যিই আমি ফীল করি।...কিন্তু কী করবো? আমার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে তেমন ডিসেণ্ট কেউ নেই যে! নইলে থাকলে কি তাদের সঙ্গে আমি তোমার ভাব করিয়ে দিতাম না? কিন্তু থাকলে তো?' বলে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফ্যালে: 'সত্যি, এক-এক সময় তোমার জন্যে এমন আমার দুঃখু হয়, এত মন খারাপ করে!'

'তাই যদি হয় তো এইভাবে না কাটিয়ে, এমন ছন্নছাড়া না থেকে, নতুন জীবন শুরু করো না কেন?' আর্তনাদের মতো শোনানো গলার চড়াইটা হঠাৎ যেন কোমলতার খাদে নেমে আসে, গুণগুণানির মতোই শুনায়—'ভালো একটা চাকরি বাকরি জুটিয়ে...জুটিয়ে নিয়ে...আমায় বিয়ে করো না কেন তাহলে?'

'অ্যাঁ, কী বললে?' শিউরে ওঠে বিকাশ, এক ঢোঁক গরম কফি গিলে ফ্যালে।—'তোমার কথা শুনে আমার পিলে চমকে

গিয়েছিলো। মনে হয়েছিলো বুঝি তুমি সিরিয়স্‌লি বলছো। অমন কথা আর বলো না।'

'কিন্তু সত্যি—সত্যিই আমি কথাটা সিরিয়াস্‌লি বলেছিলাম।'

'তাহলে কথাটা খুব বিচ্ছিরি—আমি বলবো। এর চেয়ে খারাপ কথা আর হতে পারে না। বিশেষ করে এই সকাল বেলায়, যখন খালি পেটে কিচ্ছু পড়েনি, আমার প্রতিরোধের শক্তি স্বভাবতই যখন খুব কম। আমার এই দুর্বল মুহূর্তে এমন প্রস্তাব··· না, মঞ্জু, না। এরকম কঠোর আঘাত তোমার কাছ থেকে আমি কখনো আশা করিনি।'

'বিকাশ!'

'তা বলে কি আমি তোমায় ভালোবাসিনে?' বিকাশের আরেক দফা অনুযোগ শোনা যায়: 'ভালোবাসি। ভয়ঙ্কর ভালোবাসি। তোমার জন্যে আমি পাগোল। কিন্তু তাই বলে—ভালোবাসি বলেই যে···মানে, ভালোবাসলেই যে বিয়ে করতে হবে তার কোনো মানে হয় না। ভালোবাসাটা বিয়ের কোনো কারণই নয়।'

'কিন্তু তাই তো কারণ ছিলো এতদিন।' মঞ্জু জানায়। —'এতদিন তো তাই জানতাম।'

'বোকাদের কাছেই। তুমি ভালোই জানো যে, বিয়ে করার ছেলে আমি নই। কোনোদিনই বিয়ে আমি করবো না। তাছাড়া, বিয়ে যে করবো—যদি করিই—তুমি আমার খরচ চালাতে পারবে? তোমার ঐ একলার টাইপিস্টের রোজগারে চলবে আমাদের দুজনের?'

'তাহলে রইলো তোমার মিষ্টিমুখ। তোমার এই হালখাতা তুমি একলাই করো বিকাশবাবু।' বলে মঞ্জু ভ্যানিটি ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়ে : 'আমি চললাম। তোমার মতো বর্বরের কাছে যে আমি···আমি যে···' বলে কথাটা অসমাপ্ত রেখেই ব্যাগ ছুলিয়ে সে বেরিয়ে যায়।

ভাঙা মন নিয়ে বাড়ি ফিরে মুখ গুঁজে পড়ে বিছানায়। তার ভগ্ন হৃদয়ের সাথে সুর মিলিয়ে কী যেন মড় মড় করে ওঠে। মর্মর ধ্বনিটার সূত্র খুঁজতে গিয়ে সকালের কাগজখানা বালিশের তলা থেকে হাতড়ে পায়।

সকাল থেকেই বিমনা তো! পড়া হয়নি আজকের কাগজটা।

কাগজটা নিয়ে পড়ে। পাত্রপাত্রী-কলমের খবরগুলিই তার নজরে পড়ে সব আগে।

একটিতে গিয়ে তার দৃষ্টি যেন আটকে যায়···

'আধুনিক বিবাহ-সংঘটক—প্রাপ্তবয়স্ক যেসব আধুনিক এবং আধুনিকা, অভিভাবকের ইচ্ছামতো বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, তাঁদের নিজেদের রুচি ও পছন্দসই পাত্রপাত্রী নির্বাচনে আমরা সর্বরকমে সাহায্য করিয়া থাকি। যে কোনোদিন সকালে আমাদের কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করুন—'

পড়েই না সে লাফিয়ে ওঠে। এই তো! এই তো সেই সেতু —কন্যাকুমারিকার থেকে স্বর্ণ-লঙ্কার। স্বর্ণালঙ্কার—বাড়ি—গাড়ি—শাড়ির স্বপ্নরাজ্যে!···

লাফিয়ে ওঠে সে বিছানার থেকে—তার আওয়াজী ঘড়িতে

সকাল ছ'টার সাড়া পড়তে না পড়তেই! সকালের ছটা জানালার আকাশে দেখা দেবার সাথে সাথেই।

উঠেই, স্নানটান সেরে, সাজগোজ করে সে বেরিয়ে পড়ে সেই বিবাহ-সংঘটকদের ঠিকানায়।

আধুনিক প্রজাপতিটি তাঁর আপিসেই ছিলেন। ছোট্ট কামরাটার গলা-কাটা তলা-কাটা আধা-দরজাটা ঠেলতেই তাঁর দর্শন মেলে।

'কী চাই আপনার?'

মঞ্জু একটু ইতস্তত করে। কি করে যে চাহিদাটা জানানো যায়?···

'যদি আপনি কোনো পার্টি কি চ্যারিটি কি কোনো পূজো কমিটির পক্ষ থেকে চাঁদা আদায়ে এসে থাকেন তাহলে গোড়াতেই জানাই যে—'

'না, সেজন্যে আমি আসিনি।···এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। কালকের কাগজে আপনাদের বিজ্ঞাপনটা দেখেছি···হঠাৎ চোখে পড়ে গেল···'

'ও, সেইজন্যে? বেশ তো, বলুন আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'বলছিলাম যে···যদি আপনাদের পক্ষে সম্ভব হয়···মানে, যদি আপনারা পারেন...'

'কেন পারবো না? এই তো আমাদের কাজ···তা, আপনার নিজের জন্যেই কি?'

মঞ্জুর দু' গাল লাল হয়ে কথাটার জবাব দেয়।

'বস্থন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? এ-কথায় সঙ্কোচের কী আছে? আস্থন, কাজের কথায় আসা যাক তাহলে…'

প্রকাণ্ড এক রেজিস্টারি খাতার ছককাটা খুপরিতে কাজের কথাগুলি লিপিবদ্ধ হতে থাকে…পাত্রীর নামধামবয়স, কী ধরনের পাত্র চাই এবং আরো অনেক কিছু—যার বেশির ভাগই মঞ্জুর মনে হয় নিছক নাহক।

তারপরে জিজ্ঞাসাবাদে আবার সেগুলি ঝালিয়ে নেয়া হয়…

'আপনার নাম মঞ্জুশ্রী দেবী? ঠিকানা, ইটিলি হাতীবাগান। বয়েস একুশ? দেখতে নেহাৎ মন্দ নয়—অ্যাঁ, কথাটায় আপনার আপত্তি আছে? বেশ ওটা কেটে সুশ্রী চেহারা করে দিচ্ছি তবে,—তাহলে তো হবে? তার পরে, আপনি পাত্র চান তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে—সবল, সুস্থ, প্রিয়দর্শন—ভালো চাকরে…পদস্থ সরকারী কর্মচারী হলেই ভালো হয়…কিম্বা নিজেদের ব্যবসা রয়েছে…ব্যবসায় বার্ষিক আয় অন্তত: বিশ থেকে পঞ্চাশ হাজারের ভেতর হওয়া চাই…এই তো? ইনকম ট্যাক্স ফ্যাক্স বাদ দিয়ে—কেমন? এই? এই তো আপনি চান?'

'হ্যাঁ।'

'আর তা যদি না হয় তো কলকাতায় খানকয়েক বাড়ি থাকলেও হবে। এমন যদি কোনো ছেলে…বেশ বনেদী ঘরের হয়…তাহলেও আপনার অমত নেই? বাড়িভাড়ার থেকে মাস মাস অন্তত হাজার খানেক আসে, এইটা হওয়া বাঞ্ছনীয়?'

'বাঞ্ছনীয়।'

'সেই সঙ্গে যদি একখানা মোটর থাকে…নামকরা মডেলের

বেশ একটু দামী গাড়ি হলেই ভালো হয়, কেমন, এই তো চান ?'

'তাই বটে।'

'আর তার ওপর, কলকাতার বাইরে—দেওঘর কি মধুপুরে, পুরী কিম্বা দার্জিলিঙে, নিদেন পক্ষে ঘাটশিলাতেও, বেড়াতে যাবার মতো বাংলো প্যাটার্নের একটা বাড়ি, অবশ্যি যদি সেটা সম্ভব হয় ?'

'সম্ভব হয় যদি।'

'বেশ। সব ঠিক আছে। ধন্যবাদ। আপনাকে ধন্যবাদ।' প্রজাপতিটি মঞ্জুকে সাদর সম্ভাষণ জানায়: 'সাধুবাদ দিই আপনাকে। আরো আমার ঢের মেয়ে ক্লায়েণ্ট আছে তো, তাঁদের দেখেছি, তাঁরা ঠিক যে কী চান তা তাঁরা নিজেরাই জানেন না—সেটা বোধ করি মেয়েমাত্রেরই স্বভাব-দোষ। কিন্তু না, আপনাকে এই প্রথম তার ব্যতিক্রম দেখলাম। মুক্তকণ্ঠে আমি আপনার প্রশংসা করি।'

বলে ভদ্রলোক অনুরূপ আরেকটি প্রকাণ্ড রেজেস্ট্রি বই উন্মুক্ত করেন—'দাঁড়ান, এবার পাত্রপক্ষটা দেখা যাক একবার···যদি আপনার পছন্দসই মিলে যায় কাউকে···না, অধ্যাপকটি হবে না···ডাক্তার ভদ্রলোকও নন···সুগঠনা নার্সে তাঁর অভিলাষ··· বাঁকড়োর এই জমিদার ? না না, একটু মোটাসোটা মেয়েই তাঁর পছন্দ। আপনার মতো তন্বী হলে তাঁর চলবে না।···ও,—এই··· এই যে পেয়েছি···এই লোকটি হলেও হতে পারে...ভালো কথা, আপনি কিসের চাকরি করেন বললেন ? দেখি আপনার রেজিস্টারটা···'

'টাইপিস্টের কাজ। সরকারী চাকরি।' মঞ্জু তাড়াতাড়ি জানায়।

'বাঁধা একটা চাকরি আছে আপনার, ভালো চাকরিই তো? কী বলেন?...দেখুন, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আজ সকালেই আমার আলাপ, আপনি আসার খানিক আগেই। স্বাস্থ্য ভালো, হ্যাঁ, বেশ ভালোই। চেহারাও ভালো বলতে হয়। বয়েস এই তেত্রিশের ভেতর। বাজিয়ে দেখিনি, তবে মনে হয় দাঁতগুলি বাঁধানো না। অন্তত বেশির ভাগ দাঁতই তাঁর নিজস্ব বলে মনে হয়। বড়লোক যে ঠিক, তা অবশ্যি বলতে পারি না, তবে নেহাৎ ছোটলোকও নন। মেজলোক বলা যায় বরং। উচ্চাকাঙ্ক্ষী। আর, জীবনে যার দুরভিলাষ আছে, বড়লোক হতে তার কতক্ষণ? সব দিক দিয়েই আপনার ঠিক উপযুক্ত পাত্র। দাঁড়ান, তাঁকে ফোন করে দেখা যাক...নিজের ফোননম্বর তিনি দিয়ে গিয়েছেন...ফোনে তাঁকে পাওয়া যায় কি না দেখি... হ্যালো...মিস্টার চৌধুরী? ভাগ্যিস, বাড়িতে পাওয়া গেল আপনাকে। আমাদের আধুনিক বিবাহসংঘটকে আপনি চট করে একবার আসতে পারেন এক্ষুণি?...হ্যাঁ...পাত্রীর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। দেখতে সুশ্রী, তন্বী...হ্যাঁ হ্যাঁ...ঠিক যেমন যেমনটি আপনি চেয়েছেন। আসছেন? আচ্ছা...'

একটু পরেই চৌধুরী এসে হাজির। ট্যাক্সির আওয়াজ না মিলোতেই দ্বারভেদ করে সে আসে—দুদ্দাড় করে। 'কই, দেখি কেমন পাত্রী আমার?"

বলতে গিয়েই সে চমকে যায়, থমকে যায় হঠাৎ—'ওমা!... তুমি?'

'বিকাশ—?' মঞ্জুও কম চমকিত নয়।—'তুমি এখানে?'

কিন্তু বিকাশের চমক তারপরও চলে···

'সংঘটকমশাই, এ আপনাদের কেমন ধারা? নববর্ষের প্রথম দিনটিতে কাল প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আর না, এবার ঘর বাঁধবো, লক্ষ্মীছাড়ার মতো থাকবো নাকো, গৃহলক্ষ্মী একটি জুটিয়ে সারাজীবন পায়ের উপর পা দিয়ে···কিন্তু এ কি? এই কি আপনার পাত্রী নাকি? ওর যে পাই পয়সাও নেই মশাই! মেয়েটা নিশ্চয় আপনাকে গুল মেরেছে। আপনাকে ধাপ্পা দিয়ে স্রেফ ও আমায়...'

'কী! আমি তোমাকে ধাপ্পা দিয়েছি?' গর্জে ওঠে মঞ্জু: 'এই বলে তুমি আমার অপমান করতে চাও?'

'আমি তোমার অপমান করলাম? তুমি বলছো কি মঞ্জু? আমার নতুন বছরের সংকল্পটাই তুমি মাটি করে দিলে! তুমি নিজেই কাল বিয়ের এই আইডিয়াটা আমার মাথায় ঢুকিয়ে আর আজ কিনা শেষে তুমিই আবার···হায় হায় সেই-তোমাকেই আমায় বিয়ে করতে হলো শেষটায়?'

বিয়ের আগেই বিকাশ হায় হায় করে। মঞ্জু কিন্তু তখনো গজরায়:

'তোমার মতো বর্বরকে কেউ বিয়ে করলে তো!'

ডালুমাসির ঝি!

'রাঁধে আবার, জানলে?' বললো মিনি।

শুনে তো আমি অবাক! শালুমাসিকে রাঁধুনীর ঝি-গিরি করতে হয়, আর এদিকে ডালুমাসির কপাল ছ্যাখো! তাঁর ঝি নাকি রাঁধে! যেমন সে এধারে ঝিয়ের খিদ্‌মৎ খাটে, তেমনি ফের খিদে মেটানোর দিকেও আছে! থালাবাটি মাজা ঘষা, যাকে নাকি বাসন-বিলাসও বলা যায়, সেরে নিয়ে উনুনে আর নুনে গিয়ে পড়ে। মুখ হাঁড়ি না করে হাঁড়িমুখো হয়। ঘড়া ঘড়া জল তোলার পরেও কড়া মেজাজ না দেখিয়ে রান্নাঘরের কড়া চড়ায়।···বিশ্বাস হয় না।

'কিন্তু তার সঙ্গে কারু কথায় পারবার যো নেই—' মিনির অনুযোগ শোনা যায়।—'এক গেলাশ জল গড়িয়ে দিতে বলেছো কি এমন বকবক লাগাবে যে—'

'তা, বৌ-ঝিরা একটু বকেই।' না বলে আমি পারি নে—'এক-একটা বৌ-এর আবার এতই বকুনি যে তার চোটে বাড়িতে তিষ্ঠোনো যায় না। কাকচিল পর্যন্ত পাড়া ছাড়ে। বাড়ি ফিরলেই, শুনেছি, এক-একজনের বৌ এক নাগাড়ে এমন নাকি বকে যায় যে, তার দাপটে কর্তারা ভয়ে বাড়িই ফেরে না। রাত্তিরেও নয়। স্রেফ বখে যায়।'

'আমাদের ঝি-টি সেসব বৌ-এর বাবা।' মিনি বাতলায়:

'তোমার মতন কথাশিল্পীকে সে এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচে আসতে পারে। কথায় কথায়।'

'ওরেব্বাবা! তাহলে আর আমি তোদের বাড়ি পা বাড়াচ্ছিনে—'

'কেন, তুমি যাবে আমাদের কাছে, ঝিয়ের সঙ্গে তোমার কী? তুমি তো আর ঝিয়ের সঙ্গে আড্ডা মারতে যাচ্ছো না? সেও কিছু গায় পড়ে তোমার সঙ্গে কথা কইতে আসছে না। ঝিয়ের কথায় যাবার তোমার দরকার?'

'তা বটে! কিন্তু তাহলেও আমার বরাতের কথাটা ভাবছি। আমার পোড়া কপালে শালুমাসির রাঁধুনী—সে মোটেই রাঁধে না, আর তোদের ঝি, যদিও বা রাঁধে—কী মুস্কিল ছ্যাখ্ একবার! একজন লেখিকা আরেকজন কথিকা! কোথায় যাবো বল্ তো? কোন ঝিকরগাছা ঘাট থেকে এমন ঝি আমদানি করলি শুনি?'

'কি করে জানলে? ঐদিকেই ওদের বাড়ি বটে···ঝিকরগাছা ঘাট পেরিয়ে কোথায় যশোরে না খুলনায়! পাকিস্তান থেকেই আসা কিনা! কোন এক উদ্বাস্তু কলোনী থেকে মা নাকি বেছে বেছে এনেছে।'

'রূপ দেখে আনেননি নিশ্চয়। কোনো মেয়ের রূপ দেখে ভুলবেন ডালুমাসি আমার সে-পাত্রী নন। কী গুণ দেখে আনলেন তিনিই জানেন!'

'কেবল একটা গুণে। মেয়েটা আমাদের ভাষায় কথা বলে—এই কলকেতার ভাষায়। বাঙালে কথা মা দু' চোখে সইতে পারে না, জানো তো?'

শুনে আমি কানে আঙল দিই।—'হু' কানে। হু' কান বল। কথা শুনতে হলে কর্ণপাত করতে হয়। বিশেষ করে তোদের ঝিয়ের কথা যা বলছিস—তেমন কুরুক্ষেত্র ব্যাপার হলে তো বটেই। কর্ণ-পাত না হয়ে যায় না।'

'ও নাকি এর আগেও দেশ থেকে এসে অনেকবার এখানে কাজ করে গিয়েছে। কলকাতার অনেক বড় বড় বাড়িতেই নাকি। আর তাই থেকেই এখানকার বোলচালে বেশ সড়গড়।'

'তাই না কি ?···তাই ! কথাশিল্পিনী সেইজন্যেই।'

'আলিপুরের বাড়িটা খালি হতেই—অমন বাড়ির ভাড়াটে কোথায় পাবো এখন ?—আমরা নিজেরাই সেখানে গিয়ে উঠেছি কিনা ? এখন অত বড় বাড়িতে একটা ঝি না হলে চলে না, তাই মা বিস্তর রিফিউজি ক্যাম্প ঘুরে···আমাদের বাচ্চা বেয়ারাটার কথা বলছো ? সে-ব্যাটা অতগুলো ঘর না দেখেই, আর তার ঝাড়পোঁছ করতে হবে শুনেই না—প্রথম দিনেই ভাগল্‌বা।'

'ভারী বেয়াড়া তো !'

'তাই মা অনেক উদ্বাস্তু ঘেঁটে শেষে ওকেই···হ্যাঁ, যেজন্যে এলাম সেই কথাই বলছি। অত বড় বাড়ি টিপ্‌টপ্‌ রাখা একটা ঝিয়ের কম্মো নয়। একটা চাকরও দরকার। কিন্তু ওরকম কাচ্চাবাচ্চা হলে চলবে না বাপু ! বেশ বড়ো সড়ো। জোয়ান সমত্ত। তাই মা তোমার কাছে পাঠালেন। যদি তোমার জানাশোনা কেউ থাকে···'

'না বাপু! শালুমাসির রাঁধুনী খুঁজতেই যা হয়রান হয়েছি তারপর তোমাদের চাকরের খোঁজে বেরুতে হলে আমাকেই আর

খুঁজে পাবে না। তোর আর-সব কাজিনদের ধর্ গে—ডালুমাসির পছন্দসই চাকর তারাই যদি আনতে পারে। তাদের হচ্ছে ডালে ডালে বিচরণ। আর, আমার দেখছিস তো—এই পাতায় পাতায়। এই সব খবর কাগজের।'

বলে সেদিনের কাগজখানা টেনে নিয়ে, উদাহরণস্বরূপ, আমি পড়তে লাগি।

কাগজের সবচেয়ে ইণ্টারেস্টিং কলম—পাত্রপাত্রী-সংবাদ নিয়ে পড়ি। পড়তে পড়তে খট করে আমার মনে লাগে।

'ভালো কথা, শালুমাসি যেমন কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে রাঁধুনী পেয়েছে তোরাও তো তেমনি—' খটকাটা আমার ব্যক্ত করি।

'হায়, নেহাৎ কাজিন যদি না হতাম তাহলে তোদের বিজ্ঞাপনটা দেখলে আমিই যে আবেদন করে দিতাম রে—'আমায় চাকর রাখো, চাকর রাখো, চাকর রাখো গো!' বলে অবৈষ্ণব পদাবলীর একখানা, কীর্তনের সুরে, বাবা গণেশের নাকের মতো আড়াই হাত লম্বা করে ছুড়ে দিই।

(গণেশের নাকের মতন ঠিক না হলেও, সুরের 'নাকামি'-তে আমার কীর্তন স্বভাবতই ছুঁচোলো। শ্রোতার কানের ভেতর দিয়ে মর্মে গিয়ে ছুঁচের মতোই ফোটে!)

আমার শুঁড় খেলানোয় মিনি ছটফট করে ওঠে—'বলে, তোমার ইয়ার্কি রাখবে? আচ্ছা, বিজ্ঞাপনে কী লিখতে হবে বলো তো? উত্তম আহার, অপূর্ব বাসস্থান, মোটা বেতন, অল ফাউণ্ড—এই সব কথাই কি?'

'কিছু না, শুধু খালি জানিয়ে দে যে, চাকরকে দৈনিক বাজার

করতে দেয়া হবে। তাহলেই তোর চাকররা সব লাফাতে লাফাতে আসবে। বেতন যাই হোক না।'

'কেন, বাজারে কী আছে?' মিনি শুধোয়। একটু যেন অবাক হয়েই।

'বাজারেই তো টু পাইস। মাইনে যা হোক তা হোক, উপরি কিছু একটা থাকলেই তবেই না পুষিয়ে যায়? বেতন তো হক্কের পাওয়া, নিতান্তই নাহক; উপরি পাওনাটাই হচ্ছে আসল। আয়করকে ফাঁকি দিয়ে এই আয় করা—প্রায় সব চাকরেই করে থাকে। এমন কি, তোদের বাড়ির চাকরিটা নিতান্ত বেসরকারী হলেও এহেন লাভের মোকা কেউ ছাড়বে না। যেন তেন প্রকারেণ, এই আয় করবেই।' আমার রায় দিই।—'ঝির মানে যেখানে আয়া, চাকর মানেই সেখানে আয়। নইলে চাকরির কোনো মানেই হয় না।'

:

দিনকতক পরে ওদের আলিপুরের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি এক সকালে। একটু ভয়ে ভয়েই, বলতে কি!

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই—

কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে যিনি দেখা দিলেন, তিনি—না, মিনি নন, ডালুমাসিও না—নিঃসন্দেহ, সেই ঝি।

'দেরি হয়ে গিয়েছে যে-। ন'টার মধ্যে দেখা করার কথা ছিলো না?' ঝিঝিলো গলার থেকে বেরুলো।

'ন'টার মধ্যে?' কিছুই না বুঝতে পেরে বোকার মতন আমি আওড়াই।

'হ্যাঁ। ন'টার পর গিন্নিমা দিদিমণিকে নিয়ে বাজার করতে বেরিয়েছেন।'

গিন্নিমার আমার দরকার ছিলো না, মিনিদিদিকে পেলেই চলতো। এবং, তাঁর দর্শনেই আমার যাওয়া।

'ন'টার আগে এলে দেখা হতো?' আমি শুধালাম।

'কাগজে তবে কী দেওয়া হয়েছে শুনি? ত্যাখোনি বুঝি?' ঝি বলে: 'ন'টা পর্যন্ত দেখে তবে গিন্নিমা বেরিয়েছেন। এই তো পড়ে রয়েছে কাগজ, ত্যাখো না পড়ে।'

টেবিলের থেকে খবর কাগজটা কুড়িয়ে সে আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়।

পড়ে দেখি। সত্যি বলতে, আকাশ থেকে পড়ে দেখি:

'একটি উপযুক্ত খানসামা চাই। অল্পশিক্ষিত হলেও ক্ষতি নেই। দেখা করার সময়, সকাল আটটা থেকে ন'টার মধ্যে। পুনশ্চ, চাকরকে বাজার করতে দেয়া হবে।'

বাজারের পুনশ্চটাও দেখি। ব্যাজার মুখেই দেখতে হয়।

'আমি তো—' ভেব্ড়ে গিয়ে আমি বলতে-যাই।

চাকরির সম্পর্কে নয়, পারিবারিক সম্পর্কেই আমার যাওয়া, সেই কথাই হয়তো বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমিত্বের পরিচয় প্রকট করার আগেই ওদিক থেকে ফের ধাক্কা আসে। আরেক ধাক্কা।

'ত্যাখো বাপু, চাকরি করতে এসে গোড়াতেই এক গাল দিব্যি গেলো না। ওসব বাজে অজুহাত আউড়ে কোনো লাভ নেই।

অবশ্যি, চাকরি করতে যখন এসেছো তখন মিথ্যে বলতে হবে বৈ কি। মিথ্যে কথাও বলবে, চুরিও করবে—কিন্তু তাই বলে কি পীরের কাছে মাম্‌দোবাজি? আমাকেই ধাপ্পা মারা? ঝিয়ের কাছে কি চাকরের চালাকি খাটে? এতক্ষণ যে তুমি পড়ে পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিলে তা কি আমি জানিনে? তা তোমার চোখ মুখ দেখেই আমি টের পেয়েছি। সেই কথা বললেই হয়।'

আমি আর কোনো কথা বলি না। নাকের ডাকাতির কথা জানিনে, তবে ঘুমুচ্ছিলাম সত্যিই। সাড়ে আটটার পর উঠে টুথব্রাশটা হাঁকড়েই আলিপুরের ট্রাম পাকড়েছি।

'তবে হ্যাঁ, গিন্নিমার কাছে অবশ্যি আলাদা। সব জায়গায় সব কথা বলা যায় না। সেখানে তোমাকে অন্য গান গাইতে হবে। কী বলবে সে যদি তুমি না জানো তো আমি তোমায় শিখিয়ে পড়িয়ে দেবো। মনে হচ্ছে খানসামাগিরিতে এখনো তেমন তুমি পোক্ত হওনি। তোমার চেহারা দেখেই মালুম হচ্ছে। তা হোক, শিখে নেবে দু'দিনে। শিখে নিলেই কিছু না, নইলে এসব ভারী শক্ত কাজ। তা, দেশ থেকে আসা হয়েছে ক'দ্দিন? সেই প্রথম হিড়িকেই? না কি, গেলবারের ডামাডোলে?'

'ডামাডোলে?' আমার মুখ থেকে গলে আসে।

'আমি অবশ্যি ডোলের লোভেই এলাম। সরকার এখানে 'ডোল' দিয়ে বসে বসে খাওয়াচ্ছে তাই শুনেই আর থাকতে পারলাম না! অবশ্যি, তার আগে—সেই প্রথম চোটেও—এসেছিলাম। তারপর যাচ্ছিলাম আসছিলাম—'ডোল' দেয়া বন্ধ করলেই চলে যাই—শুরু হয়েছে শুনলেই চলে আসি—এম্‌নিই

চলছিলো—' ঝি তার দোললীলার কাহিনী ব্যক্ত করে—'কিন্তু এবার যে এসেছি, পাকিস্তানে আর ফিরবো না বলেই। আর ওমুখো হচ্ছিনে। এখেনেই খেটে খাবো। তা, তুমিও কি শেয়ালদাতেই পড়েছিলে? সত্যিক জাতের সঙ্গে সেই প্যালাট্‌ফর্মেই? ও! তাহলে এখন থাকা হচ্ছে কোথায়? কুপারস্ ক্যাম্পেই নাকি?'

কী আশ্চর্য! কুপার স্ট্রীটে এক আত্মীয়ের বাড়ি মাঝে মাঝে খুঁটি গাড়ি—এ-মেয়েটা তা টের পেলে কি করে?

'থাকি না তো সেখানে। মাঝে মাঝে যাই বটে—' বলতে যাচ্ছিলাম আমি, কিন্তু এগুতে পারলে তো? ঐ 'থাকি না' পর্যন্ত গিয়েই থেকে গেলাম।

'থাক, বুঝেছি।' সে বাধা দিয়ে বলে—'আর বলতে হবে না। আমাগো উদ্বাস্তুগো আবার থাকা-থাকন!—আমাদের বাস্তুহারাদের থাকাথাকি কী! হ্যাঁ, ভালো কথা, কলকাতার বড়লোকদের বাড়ি যদি চাকরি করতে চাও তো ভুলেও কখনো যেন কোনো বেফাঁস কথা উচ্চারণ করো না। বেফাঁস কথা মানেই বাঙালে কথা। এখানকার ঘটিরা, বিশেষ করে এই ঘটিগিন্নিরা আমাদের দিশী কথা একেবারেই সইতে পারে না। মানেই বুঝতে পারে না তো সইবে কি! শুনলেই ঘাবড়ে যায়। তা, তুমি যদি—'

'মানে আমি—'

'মানে, কলকাত্তাই কথা যদি তোমার তেমন রপ্ত না হয়ে থাকে তো অল্প কথায় কাজ সারবে। আর, এখানে যদি তোমার থাকা হয় তাহলে আমিই তোমায় শিখিয়ে দেবো। আমার

কাছে শুনে শুনেই শিখতে পারবে তুমি। শেখাটা এমন কিছু শক্ত নয়।'

'আমি বলছিলাম কি—'

'যা বলছি শোনো। শুনে শুনেই শেখা যায়। আর পড়ে পড়ে। নভেল বই পড়তে হয়। বই-এর মধ্যেই এখানকার সবরকমের বুলি দেয়া আছে। কোথায় পাবে বই? যেখানেই কাজে লাগো না, দেখবে যে সে-বাড়ির দাদাবাবু দিদিমণিরা লুকিয়ে লুকিয়ে নভেল পড়ে। পড়ার বই ফেলে রেখে। সকালে তাদের বিছানা তুলতে গেলেই দেখতে পাবে বালিশের তলায়। তারা স্কুল কলেজে বিদেয় হবার পর তখন তুমি নিয়ে পড়ো না। পড়া হয়ে গেলে আবার বালিশের তলায় গুঁজে দাও। বাংলা নভেল যদি পড়ো তো দু'দিনে নিজের মাতৃভাষা তুমি ভুলে যাবে। বাঙাল ভাষা ভোলা আর এমন কি, বলে অমন উড়েই আমি ভুলে গেলাম! বলি তোমায়, ডামাডোলের আগেও তো দেশ থেকে আসতাম ঝি খাটতে। থাকতাম মেদিনীপুরীদের বস্তিতে। মেদিনীপুরের ঝিয়েদের আড্ডা সেটা। তাদের সঙ্গে মিশে মিশে শুনে শুনে উড়ে কথা এমন চমৎকার বলতে কইতে শিখেছিলাম যে,' সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফ্যালে: 'তার একটা কথাও যদি আজ বলতে পারি।'

এবার সত্যিই আমার তাক লাগে। উড়ে এসে জুড়ে বসে— এই তো জানি। কিন্তু জাঁকিয়ে বসার পর আবার তা নাকি উড়ে যায়?

'হাঁ করে ভাবছো কি? অবাক হবার কিচ্ছু নেই। সঙ্গদোষে

শেখে মানুষ। সঙ্গদোষেই ভুলে যায়। বাঙাল ভাষা ভুলে গেলাম ঘটিদের সঙ্গে থেকে থেকে। কলকাতার বড়লোকদের বাড়ি গতর খাটিয়ে। গিন্নিদের সঙ্গে বকর বকর করে। রাতদিন তাদের বকুনি শুনে শুনেই এখানকার বোলচাল রপ্ত হয়ে গেল। তাই বলছি বাপু, যদি এবাড়ির কাজে টিকতে চাও তো বাঙাল ভাষা ভুলে যাও একদম। আলিপুর বালিগঞ্জের মা-গিন্নিরা তোমাদের ওই কাঁইমাই বরদাস্ত করতে পারে না। তাদের মাথা ধরে যায়।'

'তাই নাকি?'

'তবে আমাদের গিন্নিমাটি লোক ভালো। মাটির মানুষ। বকে ঝকে না মোটেই। কোনো জিনিস নাপছন্দ হলেও কিছু বলে না। কেবল বিষণ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বিষণ্ণদৃষ্টি কাকে বলে জানো না বুঝি? নাটক নভেল না পড়লে আর কি করে জানবে? কোনো অঘটন হলে এই—এমনি করে তাকান গিন্নিমা', বলে সে বিষণ্ণ দৃষ্টান্তটা আমার চোখের সামনে স্থাপন করে।

'ও!'

'আমি যখন পেয়ালা কি পিরিচ ভাঙি তখন গিন্নিমা ঐভাবে তাকান। এমন কি, খুব দামী জিনিস নষ্ট করলেও একটুও তিনি বকেন না। শুধু বিষণ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। প্রথম দিনকত খুব পেয়ালা ভাঙলুম, তিনটে টি-সেটই উজাড় করে দিলুম—কিন্তু একটা কথাও তিনি বললেন না। খালি ঐ বিষণ্ণদৃষ্টি! তখন মাসখানেক পরে বাধ্য হয়ে অ্যালার্ম ঘড়িটা আমায় ভাঙতে হলো!'

'সেই দামী ঘড়িটা ? অ্যাঁ ?' আমি আঁৎকে

'ঘড়িটা গিয়ে পাপ গিয়েছে। এখন আর সহজে আমার ঘুম ভাঙে না। অনেক বেলা অব্দি ঘুমোতে পারি বেশ। দম দিতে গিয়ে হাত ফসকে যেদিন ওটা পড়ে গেল—ভাবলুম না জানি কী হবে! কিন্তু গিন্নিমা কিছু না বলতেই আমায় মাপ করলেন। শুধু একটু বিষণ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন খানিক। আমি বললাম—রবিবার দিন আমায় ছুটি দিয়ো আর টাকা দিয়ো, আরেকটা অ্যালারাম্ আমি কিনে আনবো। গিন্নিমা ছুটিও দিলেন টাকাও দিলেন—কিন্তু বলাই বাহুল্য যে, সারা দিন গোটাবাজার ঘুরেও একটাও ঘড়ি আমি পেলাম না। টাকাটাও ঘুরিয়ে দিলাম না। সিনেমা দেখলাম, শাড়ি কিনলাম সেই টাকায়।'

'বাঃ, বেশ তো!' তারিফ না করে পারি না।

'রান্নার কাজ জানো, একথা যেন বলো না কক্ষনো। রান্নার কাজে ভারী ঝামেলা। খানসামার কাজই আরামের। ঝাড়া পোঁছার কাজ বই তো না। হাল্কা কাজ। তা বলে যে সারা বাড়ি তোমায় ঝাঁটাতে হবে তা নয়। আমি তো ঝিয়ের কাজ করতেই এসেছিলুম গো, কিন্তু গিন্নিমার কথায় রাঁধি এখন। রাঁধাও এমন বেশি কিছু না। শাক-চচ্চড়ি ডাল ভাত রাঁধতে হয়। দেখলাম যে রান্নাই বেশ। এত বড় বাড়ি, ধুলো বালি কালি ঝুলে ঘরগুলো ভর্তি—এসব সাফ করা কি একজনের কাজ?'

'তা বটে।' ওর সাফাই মানতে হয়।

'গিন্নিমা যেদিন বললেন, ছাখো ঝি, এখানটায় এক হাঁটু ধুলো আর ওই কোণটায় একগাদা ঝুল জমে রয়েছে দেখেছো? আমি

বললাম, আমি কী করবো? আমার সময় কই? গিন্নিমা শুধু বিষণ্ণচোখে তাকালেন আর বললেন—তা বটে, এত বড় বাড়ি আর একজন মোটে লোক! পারবে কেন!'

'তা বটে! মানুষ তো!' আমাকেও সায় দিতে হয় ওর কথায়। 'ঘোড়া তো নয়!' আমি বলি, 'এসব ঘোড়ার ডিমের কাজ পারবে কেন?'

সত্যি বলতে, ডিমের কাজ (কিম্বা কাজের ডিম) মুর্গিতেই পাড়ে—ঝি-চাকরে পারে শুধু ঘোড়ার ডিম।

'গিন্নিমার তো জানা নেই যে, দেশে থাকতে আমি সেই মুর্গিডাকা ভোরে উঠতাম—সেই পাঁচটায়। আর, উঠেই আমায় কাজে লাগতে হতো। মা-মাসি-খুড়ি-জ্যেঠি-খুড়ো-জ্যাঠা সবার মিলিয়ে একসঙ্গে সাতখানা আটচালা আমাদের। এ-বাড়ির চেয়ে ঢের বেশি ঘর আমাকে ঝাঁট দিতে, মুছতে আর নিকোতে হতো। তারপর ঢেঁকিতে পাড় দাও, ধান কোটো, ধান শুকোও, চাল বাছো। রাজ্যের সবাইকার কাপড় কাচো। বাসন মাজো এক কাঁড়ি। তার ওপর হাঁড়ি ঠ্যালো দু'বেলা। গুষ্টির পিণ্ডি রাঁধো। কিন্তু এখানে এসে এখন আমি ভোরে ওঠার কথা ভুলেই গিয়েছি। সূয্যি ওঠার চেহারাই মনে পড়ে না। সাতটার আগে চোখ খুলিনে কক্ষনো।'

শুনে আমার চোখ খোলে। কিন্তু মুখ খোলার সাহস হয় না।

'ছাখো বাপু, ঝি-চাকরের কাজ যদি করতে হয় তো এইসব বড় বড় বাড়িতে। এই আলিপুর আর বালিগঞ্জেই। ছোট-খাটো বাড়িতে কক্ষনো যেয়ো না। তারা তোমায় খাটিয়ে

মারবে। না খাটবার কোনো ছুতো পাবে না সেখানে—ক'খানাই বা ঘর তাদের! আর ছোট ছোট বাড়ির লোকগুলোও তেমন সুবিধের নয়। গিন্নিরা তো কেউটে। কিন্তু এইসব বড় বাড়িতে—বাড়ির চেহারা দেখেই—খাটুনির ভয়ে সহজে কেউ আসতে চায় না। কিন্তু যদি একবার ঢুকে ছাখো, দেখবে ভয়ের কিচ্ছু নেই। তুমি যে দয়া করে এসেছো তাতেই তারা বাধিত হয়ে গিয়েছে। তোমাকে পেয়েই গিন্নিমা ধন্যি! আর, তার ওপর যদি টেবিলটা একটু মোছো, বিছানাটা ঝেড়ে দাও, ঝাড়নটা একটু বুলিয়ে নাও কোথাও—তা হলে তো কথাই নেই, ভীষণ কাজ করে ফেললে। তাতেই সবাই খুশি। একটা কুটো ভেঙে যদি ছুটো করো তাতেই গিন্নিমা বর্তে যাবেন। কিন্তু খবরদার, ভুলেও যেন কুটোটাকে তিনটে করতে যেয়ো না।'

'কূটনীতিতেও তাই বলে বটে!' আমি কুটুস্ করি।

'এইসব বড় বড় বাড়ির গিন্নিরা এক ধরনের। অদ্ভুত মেজাজ এদের, কোথাও তুমি তার জুড়ি পাবে না। খাওয়া দাওয়া ভালো—মাস গেলেই বেতন, বেতনও বেশ মোটা। ভুলিয়ে ভালিয়ে মাসে ছু'বারও নিয়ে নিতে পারো—খেয়াল করবে না। আর, চাইলেই ছুটি। সিনেমা ছাখোগে। কাপড় জামা পাবে না-চাইতেই। শীতে পাবে কম্বল সুয়েটার। আর, বকসিস তো রয়েছেই। তার ওপর বাজারে যা মারতে পারো—তার কোনো হিসেব দিতে হবে না তোমায়।'

'বেশ সুখের কাজ দেখছি তো।' শুনে যেন আমি একটু প্রলুব্ধই হই। আমার একটু হিংসেই হয়, বলতে কি!

'সুখের কাজ বই কি। কিন্তু না করতে জানলে হয়। একবার কাজ দেখাতে গিয়েছো কি মরেছো। তখন খেটে খেটে মরো। তাই বলছিলাম বাপু, কোনো খাটাখাটুনির মধ্যে একেবারেই থেকো না।'

'খাট নিয়ে থাকাই তো ভালো। দিন-রাত শুয়ে ঘুমিয়ে—' বলতে যাই।

'হ্যাঁ, তাই। শুয়ে শুয়ে একটু ল্যাজ নাড়লে—সেই ঢের। আলিপুরের গিন্নিরা সেজন্যে তোমায় একটি কথাও বলবে না— একটুও রাগ করবে না তোমার ওপর—খালি বিষণ্ণদৃষ্টিতে তাকাবে। তবে হ্যাঁ, একটা কথা আমার বলবার আছে তোমাকে —অবশ্যি, যদি এখানে তোমার থাকা হয় তবেই।'

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাই। বিনাবাক্যব্যয়ে।

'অনেক চাকরের ভারী একটা দোষ, ঝি-কে তারা নিজেদের এলাকার বলে মনে করে। তাই ভেবে ঝিয়ের সঙ্গে ভাব জমাতে চায়। মুখের ভাব নয়, এই যাকে বলে—একটু ঘনিষ্ঠ ভাব। কিন্তু বাপু, ভালো করে শুনে রাখো, ওসব আমি ভালোবাসি না। মেয়েন্যাকড়ারা আমার দু'চক্ষের বিষ। চাকরদের স্ত্রৈণ হওয়াটা আদপেই আমি পছন্দ করিনে।'

'স্ত্রৈণ নয়, ঝৈন।' আমি প্রুফ কারেক্ট করি—'কথাটা হবে ঝৈন।'

'ঝৈন?'

'হ্যাঁ, স্ত্রী থেকে যদি স্ত্রৈণ হয় তাহলে ঝি থেকে—'

'কী থেকে কী হয়, সে তোমায় শেখাতে হবে না আমাকে।

আমার বেশ জানা আছে। কিন্তু বাপু, সেরকম কোনো বেচাল যদি আমি দেখি তাহলে ঝেঁটিয়ে তোমার বিষ ঝাড়বো। কথাটা বুঝতে পেরেছো, না, না? দাঁড়াও, আমার মুড়ো খ্যাংড়াগাছটা এনে তোমায় দেখাই।'

আমার সংশোধনের জন্য সে আরেক তাড়া প্রুফ আনতে যায়।

আর আমি সেই ফাঁকে, সে খ্যাংড়াপটির থেকে ফেরার আগেই ফেরার হই। এক লাফে রাস্তায় পড়ে·এক bus-এ চলে আসি নিজের আবাসে। আমার ঝিনাইদহে।